অঙ্গাঙ্গী

গণেশ চট্টোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দেবদত্ত নন্দী

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রবীর মজুমদার

প্রীতিভাজনেষু—

শেষ পর্যন্ত নিদারুণ খবরটাই এল। যদিও প্রত্যাশিত, তবুও সুধাময়ী আশা করেছিলেন হয়ত মীমাংসা হবে একটা। হল না। হাতের চিঠি হাতেই ধরা রইল। সুধাময়ীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বাইরের দিকে।

শ্রাবণের সূর্যাস্তের আকাশ। পুব দিকটা অন্ধকার হয়ে আসছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে ম্লান রক্তিমাভা।

পুত্রবধূর কাজই করেছে প্রমিতা। কোন সংবাদই বাদ দেয় নি। বাদ শুধু নিজের কথা। যা ঘটবার জন্যে অপেক্ষা করেছিল এই আট মাস—তারই সবিস্তার বর্ণনা।

সুনিশ্চিত পরিণামকে মেনে নেওয়ার নিরাসক্ত স্বীকৃতির ইঙ্গিত চিঠির কথায় কথায়। মর্মাহত সুধাময়ী আশ্চর্য হলেন ঘটনার জন্যে নয়, প্রমিতার তরফ থেকে না-পাওয়া এতটুকু অভিযোগ, ক্ষীণতম অভিমানের জন্যে। যা পেলেন সারা চিঠিতে তা অনিবার্যের পায়ে এক নারী অক্ষুব্ধ সংযত চিত্তে নতশির।

কিন্তু এ নতশির ত জন-দৃষ্টিতে দেখা দেবে পরাজয় আকারে। রূপ-ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতার কাছে প্রমিতার এ আত্মপ্রত্যাহার ত চিহ্নিত হবে পশ্চাদপসরণ রূপে। এ পরাজয় কী শুধু পুত্রবধূর? সুধাময়ীর হৃদপিণ্ডের রক্তের আন্দোলন এবার শুরু হল। ঘনীভূত অন্ধকারে শাণিত দৃষ্টি মেলে কী যেন অন্বেষণ করলেন তিনি। এ অন্ধকারেও প্রমিতার শেষ ছত্রটা যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন—

"আপনার ছেলের সম্মান রাখতে এ ছাড়া আর পথ নেই।"

এ মহানুভবতা ত দেখাতে পারত প্রমিতা জনসমাজে আইনের অস্ত্রে প্রতিপক্ষকে উচিত শিক্ষা দেবার পর। যদিও সে প্রতিপক্ষ তাঁরই রক্তে-মাংসে-মেদ-মজ্জায় তৈরী। তাই বলেই কী নাড়ির টান বড় হবে? আর সে এসেছিল বাইরে থেকে বলেই কী আজ আঁচল বিছিয়ে বসতে হবে তাকে রাস্তায়! এই দেখবার জন্যেই কি বিশ্বনাথের মাথায় জল দিয়ে আসছেন আট বছর?

সুধাময়ীর সারা দেহটা থরথরিয়ে উঠল বার কয়েক। রুদ্ধ আক্রোশে তিনি চিঠিটা চেপে ধরলেন হাতের মুঠোয়। পুত্রের সম্মান রাখতে পুত্রবধূর মহানুভবতা যেখানে হেরে যাওয়ার রূপান্তর ঘটবে—সেখানে প্রমিতা যদি কল্যাণী না হয়ে রুদ্রাণী হত, পারিবারিক এই বিপর্যয়ের মধ্যেও সুধাময়ী তবু সান্ত্বনা পেতেন। উঠে এসে জানলার ধারে দাঁড়ালেন এবার।

বৈমাত্রেয় ভাইদের অভাবী সংসার থেকে যে মেয়েকে নিয়ে এসে বধূবরণ করেছিলেন তিনি, নিজের সমাজ-আভিজাত্যের তুলনায় সে মেয়ে ত সেদিন ছিল নিতান্তই নিষ্প্রভ। অভিযোগের অন্ত ছিল না তাই। কিন্তু জাত মালির গাছ নির্বাচনে ভুল হয় নি। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ার পুত্রের ভাবী বধূ—বংশের চাকচিক্যে, বৈভবের প্রাচুর্যে আর যোগ্যতার পালিশে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে—পরিবর্তে আসছে কিনা অভাবী বৈমাত্রেয় ভাইয়েদের সংসার থেকে নেহাতই একটা পাঁচপেঁচি মেয়ে। কিন্তু এই মেয়ের মধ্যে প্রথম দেখার দিনই সুধাময়ীর তৃতীয় চোখে বোধহয় কিছু অনন্যতা ধরা পড়েছিল, নইলে ওই মেয়েকেই বা বংশবধূ করবেন কেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের কাছে সব অভিযোগ ভেসে গিয়েছিল সেদিন। গাছের গোড়া ঝেড়ে, সামান্য ডালপালা ছেঁটে, নতুন মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন সযত্নে। কিছু দিন না যেতেই ত সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল—বাগানে কিসের যেন অভাব ছিল এতদিন, এবার পূর্ণতা পেল।

এর পরই ত তিনি নিয়েছিলেন ছুটি! বুঝেছিলেন, তিনি এখন অতিরিক্ত। একজনের বিকাশের প্রয়োজনে আর একজনের বিদায়

অবশ্যম্ভাবী—তা নইলে অধিকার প্রয়োগ-ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে ঠোকাঠুকি সুনিশ্চিত। সুধাময়ী নিজেকে সেদিনই নিজের পাতা সংসার থেকে উপড়ে এনে বিশ্বনাথের চরণে অর্পণ করেছিলেন। পুত্র নিখিলেশ আত্মীয় পরিচিতের চোখে অপরাধী হবার আশঙ্কায় মিনতি জানিয়েছিল কাশীবাসী হবার সঙ্কল্প ত্যাগের জন্যে সকাতরে। প্রমিতাও সেদিন কম অশ্রু ফেলে নি। কিন্তু পুত্রের অনুরোধ, পুত্রবধূর অশ্রু পারেনি সুধাময়ীর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে। আঁচলের চাবিটি খুলে প্রমিতার আঁচলে সেটি গ্রন্থি দিয়ে, সুধাময়ী প্রসন্ন আননে উঠেছিলেন কাশীর ট্রেনে। প্রতিশ্রুতি সেদিন রেখে এসেছিলেন—দুজনের মধ্যে যেদিন তৃতীয় জনের শুভাগমন হবে, সেদিন একবার আসবেন বৈকি !

এই ত মাত্র আটমাস আগে প্রমিতার চিঠিতে জেনেছিলেন, তাঁর ইঞ্জিনীয়ার পুত্রকে কলকাতার অফিস মনোনীত করেছে জার্মানিতে পাঠাতে –"বিশেষ লোহ" উৎপাদন প্রণালী শিক্ষা লাভের জন্যে। সেদিন কোন উচ্ছ্বাসই প্রত্যুত্তরে জানাননি সুধাময়ী। এমন কি নিত্য পূজা ছাড়া বিশেষ কোন পূজাও দেননি কোন দেবালয়ে পুত্র-সৌভাগ্যের আনন্দে। কলকাতায় কোন আশীর্বাদও পাঠাননি তিনি। পাঠিয়েছিলেন যা—সে ত নির্জলা উপদেশ মাত্র। যাঁরা অর্থ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পাঠাচ্ছেন, পুত্র যেন তাঁদের সে প্রচেষ্টাকে সার্থক করে কায়মনবাক্যে।

প্রায়ান্ধকার নির্জন ঘরে সুধাময়ীর স্মরণে এল আর একটি সন্ধ্যা। ভীষণ রিক্ততা নিয়ে সে সন্ধ্যা দেখা দিয়েছিল আজকের মতই। নিখিলেশের বাবার ইহ-জীবনের শেষ সন্ধ্যা।

জ্ঞান ছিল তাঁর। কিন্তু ছিল না বাক্ শক্তি। নিখিলেশের বয়স তখন কতই বা। অপরিণত পুত্রের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি মেলে তিনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। ফোঁটা দুই জল শেষে নেমে এসেছিল চোখ দিয়ে। সুধাময়ী সেদিন যেমন অচঞ্চল হাতে শাড়ির প্রান্তটুকু দিয়ে মৃত্যু-পথিকের চোখের জল মুছে দিয়েছিলেন, তেমনি

বার বছর বয়েসের পুত্রকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন ষোলটি বছর অচঞ্চল চিত্তে। ব্রত অন্তে সাফল্য-দীপ্ত পুত্রের মুখে সেদিন যদি বা কিছু ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে—সুধাময়ী ছিলেন নির্বিকার। নির্বিকার ত এই সেদিনও ছিলেন, যেদিন পুত্রের বৈদেশিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সংবাদ প্রমিতার চিঠি মারফৎ জানতে পারেন। সে সংবাদের উত্তরে পুত্রের প্রতি ছিল অমোঘ উপদেশ আর পুত্রবধূর প্রার্থনার বিপক্ষে ছিল অভিভাবকী নির্দেশ। কিন্তু সেদিনের পুত্রবধূর প্রার্থনা যদি শাশুড়ির দৃষ্টিতে বিচার না করে মানবিক দৃষ্টিতে দেখতেন—মা, আপনি যদি অনুমতি দেন ত আপনার পুত্রের সঙ্গে আমিও যেতে পারি।

প্রমিতার অনুনয় যদি সেদিন তুচ্ছ পারিবারিক কারণে ধূলিসাৎ না করতেন, আজ কী তাহলে—

অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকা যে গাছকে একদিন সযত্নে সজীব মাটিতে বসিয়ে ফলবতী করে তুলেছিলেন—সে গাছকে কী তাহলে নিজের হাতেই উপড়ে ফেললেন? দরিদ্রকে অযাচিত ভাবে অলঙ্কারে ভূষিত করে আবার তাই অপহরণ করা—সেই ত পাপ। জানালার গরাদে মাথা রেখে অনুতাপদগ্ধ চিত্তকে শান্ত করার কোন যুক্তিই পেলেন না। জীবনে ফুল ফোটানোর সাধনায় নিরবিচ্ছিন্ন জল সিঞ্চন করে আসছেন এই আট বছর যে বৃক্ষে—আজ স্পষ্ট দেখলেন শিকড়হীন সে বৃক্ষ। কাশীবাস, উপবাস, ব্রত, তিতিক্ষা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। সুধাময়ীর দীর্ঘ আঁখি পল্লব এতক্ষণে জলভারে টলটলিয়ে উঠল।

কেদার-মন্দিরের সন্ধ্যারতির শব্দ আসছে। প্রত্যহ এ সময় দাঁড়ান গিয়ে সেখানে। আট বছরের অভ্যাস। পারবেন কেন না গিয়ে! দেয়াল আলমারিতে প্রমিতার চিঠিটা রেখে চাদরটি নিয়ে নেমে এলেন একতলায়। এ অংশটার বাসিন্দে সবাই ভাড়াটে। অবস্থা কারুরই তেমন সুবিধের নয়। গোটা বাড়িটার ভাড়া সুধাময়ী দিয়ে আসছেন মাস-মাস।

—অতুলের মা!

—ডাকছেন ছোটমা? সাড়া দিয়ে বারান্দার শেষ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক বর্ষীয়সী বিধবা।

—আজ আমার ফিরতে দেরী হবে, বললেন সুধাময়ী—তুমি ঠাকুরের আরতিটা দিয়ে দিও। আর আনন্দি এলে বল, সে যেন নিজের মতই আজ রাঁধে।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে রাস্তায় এলেন সুধাময়ী। সামান্য পথ। কেদারমন্দিরের মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘাটে।

ঘাট জনহীন। মাথার উপর শ্রাবণের কৃষ্ণকালো আকাশ। নিচে উদ্দামস্রোতা উত্তরবাহিনী। নির্দিষ্ট জায়গায় বসে চেষ্টা করলেন ধ্যানস্থ হবার ইষ্টরূপের মধ্যে।

আট বছর দর্শন করে আসছেন যে রূপমাধুরী মানস-নেত্রে, কোথায় আজ সে অঙ্গ-কান্তি! চারিদিকে অস্তিত্বগ্রাসী নিকষ অন্ধকার। মুদিত আঁখিপল্লব কখন যে খুলে গেছে আপনা হতে বুঝতেই পারেন নি সুধাময়ী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে রইলেন তিনি নিমেষ নিহত দৃষ্টিতে।

কিন্তু এ অন্ধকার ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার। অরুণোদয়ের জ্যোতি সীমন্তে নিয়ে এ তামসী পৃথিবী ত আবার দেখা দেবে নববধূর বেশে স্বমহিমায়। কিন্তু একজনের তিমির রাত্রি কী শেষ হবে কোন দিন? কোনদিন কী তার পৃথিবী হবে সূর্যকরোজ্জ্বল?

টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জলের স্পর্শে সুধাময়ী কিছুটা আত্মস্থ হলেন। যার জন্যে এখানে আসা, তা আজ নিরর্থক। উঠে এসে রাস্তা ধরলেন।

চলেই আসছিলেন জনবিরল পথে। কিন্তু এগুতে আর পারলেন না। চার-পাঁচটি কুকুর তাদের রোজবরাদ্দের চাহিদা নিয়ে সুধাময়ীকে ঘিরে ধরেছে ইতিমধ্যে। তাদের ক্ষুধা-কাতর মুখগুলির দিকে নজর পড়তে নিজের অন্তর্দাহ কিছুটা যেন শান্ত হল। এসে দাঁড়ালেন শুকলালের দোকানের সামনে।

প্রতিদিন ফেরার পথে আনা-চারেকের মতন মিষ্টি খাওয়ান সুধাময়ী গোড়েন ঘাটের এই প্রাণীগুলিকে। মিষ্টি বলতে সকালের জিলিপি, কচুরি, পড়ে থাকা কিছু হালুয়া, কিছু এটা সেটা। শুকলাল রোজই তুলে রাখে তার ছোটমার জন্যে—আজও তুলে দিল আহার্য-বস্তুগুলি সুধাময়ীর হাতে। নিচু হয়ে তিনি ধরে দিলেন কুকুরগুলোর সামনে।

বৃষ্টি নেমেছে এবার বড় বড় ফোঁটায়। অন্যদিন সুধাময়ী ঠোঙ্গাটা ধরে দিয়ে চলে যান বাড়িতে ঠাকুরের আরতি করতে। আজ কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির জল মাথা বেয়ে নেমে আসছে, চাঁদরটা সপসপে হয়ে উঠেছে। শ্রাবণের ধারা মাথায় নিয়ে অন্ধকার জনবিরল পথে সুধাময়ী অপলক দৃষ্টি মেলে নিষ্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—ক্ষুধা নিবৃত্তিরত এই কুকুরগুলোর দিকে।

ভোরেই ঘুম ভাঙ্গে নিখিলেশের। জার্মানিতে থাকতেই এ অভ্যাস হয়ে গেছে। আজও ঘুম ভেঙ্গেছে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এবং অভ্যাস মত দৃষ্টি চলে গেছে পাশের খাটের দিকে। কিন্তু সেটা যে দুদিন ধরে শূন্যই পড়ে আছে, তা দেখা সত্ত্বেও কেন যে চোখ যায়, বুঝে উঠতে পারে না নিখিলেশ। আর দৃষ্টি পড়া মানেই ত সমস্ত স্নায়ুগ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে আসা। কেমন যেন একটা নিষ্পেষণ শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যে উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিদিনের প্রভাতকে অভিনন্দন জানিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে কর্মলোকের অভীষ্ট লক্ষ্যে, আজ দুদিন হল সে বস্তুটির বিলুপ্তি ঘটেছে সম্পূর্ণ। অথচ দেহ রয়েছে নিরোগ। পৌরুষ বিকাশের সব সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। তবে কেন এ আভ্যন্তরিক নিঃস্বতা? কেন প্রভাত আনে এমন কর্ম-জড়তা? সিল্কের গা-চাপাটা ফেলে দিল নিখিলেশ সকোপে। শূন্য খাটের রিক্ততা নিয়ে যথেষ্ট বিলাপ করেছে এ দুদিন। আর না। পাশ বালিশটা এবার কোলে টেনে নিল, যেন ওটা একটা শক্তির উৎস। দু-হাতে থাবড়ালো বার কয়েক। আজ

তৃতীয় দিন। গত দুদিন দিয়েছে অকারণ প্রশ্রয় চিত্তদৌর্বল্যের। আজ তা অণুমাত্র প্রকাশের দেবে না প্রশ্রয়। আজ প্রভাত সূর্যের আলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। মাথার দিকে জানালা খুলে ফেলল নিখিলেশ।

উঠতে যাবে, অবাধ্য চোখটা আবার এসে ঠেকল পাশের খাটে। ডানলোপিলো গদীর ওপর গঙ্গামাটি রংয়ের কভার, যার শয্যা, পছন্দ তারই ওটা। বেশী জৌলুষ রং নাকি শয়ন-বিলাসের প্রতিকূল। সারা বিছানাটাই নিভাঁজ, কোথাও এতটুকু সঙ্কোচন নেই। এটাই যেন বড় বেশী উৎকট।

খোলা জানালার বাইরে মেঘ-জমা আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরাল নিখিলেশ। এই শূন্যতা যার সৃষ্টি, তারই হাত ধরে শেষ পর্যন্ত সেই ত অকপটে আবেদন করেছিল—তোমার সঙ্গে যোগসূত্র রাখায় যদি জীবনের সব সম্ভাবনার সমাপ্তি হয় ত দুঃখ করব না।

মাত্র দুদিনের কথা। কখন কীভাবে বলেছিল—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিখিলেশ। বাপের বাড়ির বড় সুটকেশটা নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে ট্যাক্সি ধরবে বলে। এতখানি আত্মাহুতি দিল যার কাছে, সেই কিনা ট্যাক্সিতে উঠে বসল স্বচ্ছন্দে! নৈতিক, সামাজিক, এমন কী আত্মিক কোন দামই দিল না আট বছর বন্ধনের। তবে? তার অবর্তমানের রিক্ততা তাহলে ওই শয়ন-শয্যাতেই শুধু থাক—মেটালজিস্টের চিত্তলোকে যেন কোন প্রতিক্রিয়া না ঘটায়।

অবশ্য নিখিলেশকে মনে রাখতে হবে আমরণ, এ শূন্যতার অর্থই ত আর একজনকে পূর্ণতা নিয়ে আসবার সুযোগ দান। কিন্তু স্মরণে রাখা কী শুধু এক পক্ষের! এই সুযোগ দেবার মূল্য হিসাবে কি না দিতে চেয়েছিল সে সকৃতজ্ঞ চিত্তে। তার স্বাধিকার প্রত্যাহারের পরিবর্তে—পৈতৃক বাড়ি, সেফ্‌টি ভল্টে রাখা ধন-ঐশ্বর্য, উপরন্তু মাস মাস হাতখরচ বাবদ উল্লেখযোগ্য টাকা ভরণ-পোষণের।

উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ত নিখিলেশ চেয়েছিল অকৃপণ চিত্তে বিচ্ছেদ সঙ্কল্পে দৃঢ়তার হাতে। নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান যেখানে স্ব-প্রকাশ, সেখানে স্মৃতি রোমন্থন অর্থহীন।

বাইরের দৃষ্টি এবার ভিতরে আনল নিখিলেশ। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে যেন স্বগতোক্তি করল—তবে তাই হোক। দূর দেশান্তর থেকে যে এল শুধু তারই জন্যে- সুস্বাগতম হোক তার আসা। দূর হোক এবার নিকটতম।

—সাব্ চা ?……চায়ের ট্রে-টা টিপয়ে রাখল রামদীন। দাঁড়িয়ে রইল প্রভুর রুচিমত হয়েছে কিনা জানার অপেক্ষায়। নিখিলেশের ইশারায় এবার চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিলে নিখিলেশ। মেঘলা আকাশের মতন মনটা যেন এতক্ষণে রৌদ্রের স্পর্শ পেল। দৃষ্টি কিন্তু এরই মধ্যে চলে গেছে—যেমন গেছে আট বছর একই ভাবে। দেখা—কখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে, কখনও সমগ্র করে। খোঁপাটা ভেঙ্গে থাকত—পাশ ফিরে শোওয়াই ছিল অভ্যেস—কত অসহায়! অথচ কী অনুপম ভঙ্গি! এক সময় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশকে শুনতে হত অনুচ্চ কণ্ঠের কৃত্রিম ক্ষোভ—কেন জাগালে না!

জাগানো মানেই ত প্রভাতী আমেজকে নিজের হাতে হত্যা করা। চায়ের মতই যে তার ঘুম-কাতর ভঙ্গিটি-নিরীক্ষণ—প্রভাতকালীন নেশা। দুটোর কোনটাকেই যে এ সময় বাদ দেওয়া—

না, কাল থেকে ড্রয়িং রুমে চা দিতে বলবে। কাল অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ত! কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ত ঘটতে চলেছে তার রূপান্তর—বলতে পারা যায় জন্মান্তরও। যে নিখিলেশ বাঁধা ছিল বঙ্গললনার আঁচলে মাতৃভূমির চৌহদ্দীর মধ্যে—সে ত মৃত। নতুন নিখিলেশের কাছে এদিন খুলে দিয়েছে বিশ্বলোকের দ্বার—তার জীবন সফল হবে বলেই ত আজ সূর্যের ওঠা। যার বদান্যতায় আজ ভারতীয় ফার্মের সে অন্যতম কর্ণধার—সেই সিন্ধুপার-বাসিনীর

কাছে গচ্ছিত আট মাস আগের প্রতিশ্রুতি, আজই হবে রূপে, বর্ণে, গন্ধে রূপান্বিত। হর্ষোৎফুল্ল নিখিলেশ চা-টা এক চুমুকেই শেষ করে ফেলল। পা-বালিশ সজোরে ঠেলে দিয়ে এবার উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াতেই মনে এল ড্রয়িং রুমের ছবি। ওঃ খুব সময়ে মনে পড়েছে যা হোক! সারা দিনের উত্তেজনায় যদি ভুল হয়ে যেত—ভাবাই যায় না সেকথা।

ড্রয়িং রুমে টাঙ্গানো আছে রোল্ড-গোল্ডের ফ্রেমে বাঁধান তাদের যুগলছবি। বন্ধু অমলের তোলা বৌভাতের রাতে। ছবিটা সরাতে হবে চিরকালের মতন। পা চালিয়ে নিখিলেশ তখনই চলে এল। দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলল। এক পা ঘরে দিতেই সমস্ত চলৎশক্তি যেন নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ছবিটা ত যথা জায়গায় রয়েছে—কিন্তু অতবড় ফ্রেমটার মধ্যে সে একা! পার্শ্ববর্তিনী! সে কোথায়? তাকে একা রেখে ছবিটা টাঙ্গালো কে?—তবে কী ঠিক তিন দিন আগে যে একাই চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে—তারই কাজ! নিথর নিস্পন্দ নিখিলেশ একটা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আর একটা যুগলহীন নিখিলেশের দিকে।

সকাল থেকে মেঘেমেঘে আকাশটা অন্ধকার। বেলা ৯টা প্রায়। স্নান সেরে ভিজে চুলের রাশ পিঠে ছড়িয়ে, পূর্ব দিকের জানালায় এসে দাঁড়াল প্রমিতা। এটা ছোড়দার ঘর। বৃষ্টি এল এমন সময় চড়বড়িয়ে।

আজ নিয়ে তিন দিন বহুবাজারে নবীন দাস লেনের বৈমাত্রেয় ভাইদের ভাড়াটে বাড়িতে এসেছে প্রমিতা।

বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন, তাঁর পেনসনের টাকায় ভাইয়েরা ছিল কালীঘাট অঞ্চলের একটা ভদ্রগোছের বাড়িতে। প্রমিতার বিয়ে ত সেই বাড়িতেই হয়। নবীন দাস লেনের এই নড়বড়ে

বাড়িতে প্রমিতার আসার দিন ত বড়দা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়েন। হবারই কথা। কোথায় রেণীপার্কের রাজপ্রাসাদ আর কোথায় এই ইটখসা বাড়ি। তিনি তখনই ছুটেছিলেন বাজারে। বড় পারশে মাছ আজ তার চাই-ই—প্রমিতা যে ভালবাসে সেই এতটুকু বয়স থেকে। ছোট কাগজি লেবু—সেটাও নিতে হবে। আর বড় দেখে আলু। আলুর খোসা ভাজা না হলে, সে ভাত মুখেই তুলতে পারত না।

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না!

থলি ভরতি বাজার নিয়ে বৃদ্ধ রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেদিন। নিখিলেশ যখন রাতে প্রমিকে নিতে আসবে—তাকেও খেতে বললে কেমন হয়!

বড়দা যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে ভরতি থলি নিয়ে বাড়িতে এসেই রাণুর মাকে তালিকা দিয়েছিলেন, কি দিয়ে কি রান্না হবে। রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে সেদিন নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন সব কিছু—যেন কোন ত্রুটি না হয় কোনদিকে। কিন্তু তাঁর এত উৎসাহ আনন্দের কোন অংশ নেন নি রাণুর মা সেদিন। তাঁর ভগ্নীস্নেহ যেন একটা আদিখ্যেতা—এই রকমই ভাবটা দেখেছিলেন গিন্নির থমথমে মুখে। সঙ্গে সঙ্গে উঠেও পড়েছিলেন তাই। ঘরে এসে কেশবিরল মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন আর নিজের অদৃষ্টকে ক্ষুব্ধ আত্মাভিমানে গালি পেড়েছিলেন। নিজের বোন না হলেও বোন ত! তার জন্যে একদিন কিছু বাড়তি খরচ—এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে! আর বোন বলে বোন—রাণী বোন! তার জন্যে এ সব আর কিছু নয়—হিংসে! আমি কি বুঝি না কিছু!

বুঝেও কিন্তু বড়দার সেদিনের আত্মক্ষোভ কিছুই প্রশমিত হয় নি। তাই প্রমিতাকে নিজের ঘরে ডেকে এনে সস্নেহে পাশে বসিয়ে উল্লাসে বর্ণনা করেছিলেন, ভগ্নীর প্রিয় খাদ্যগুলি. কি ভাবে যোগাড় করেছিলেন এবং তার পরিশ্রম হিংসাকাতর রাণুর মা'র দ্বারা

উপেক্ষিত হয়েছে—ভাববিহ্বল বৃদ্ধ সেটাও অপ্রকাশ রাখেন নি সেদিন।

—বৌদি বুঝি রাগ করেছে বড়দা? তাপশূন্য গলায় প্রশ্ন করেছিল প্রমিতা।

—করলেই বা! ওর পয়সা! আমার বোনকে আমি যা ইচ্ছে খাওয়াব তাতে—

—ঠিক কথা। কিন্তু সেটা নিমন্ত্রিত বা অতিথিদের ব্যাপারে। আমি ত তোমাদেরই। এ বাড়িতে সবাই যা খাবে আমাকেও তাই দিও, বড়দা!

—তাই বলে ওই পিণ্ডি আর ঘ্যাঁট? প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন বৃদ্ধ।

প্রমিতা শুধু বড়দার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

—প্রমি?

—বড়দা!

—একটা কথা যদি বলি, রাগ করবি না ত?

—করব, যদি অমন করে বল।

—বলছি কি, রাতে নিখিলেশ যখন তোকে নিতে আসবে, তখন ওকে খেতে বললে কেমন হয়?

আয়ত চোখ দুটি তুলে প্রমিতা সেদিন শুধু চেয়েছিল তার বড়দার দিকে।

—আরে এই ত তুই বললি, সোৎসাহে বৃদ্ধ বলেছিলেন—তুই আমাদেরই একজন। তাহলে নিখিলেশও তাই। বল ঠিক কিনা। তাই বলছি, এই আমাদের যা জোটে তাই খেতে হবে। আর বাবা থাকলে কি তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন? তুই বল?

বৃদ্ধের মর্মস্পর্শী আগ্রহের কাছে প্রমিতা সেদিন আর নিরুত্তর থাকতে পারে নি।

—এলে ত দেবে—তোমাদের যা জোটে।

—বিলক্ষণ!

—কিন্তু তিনি ত আসবেন না বড়দা।

—ও, তাহলে গাড়ি পাঠাবে শুধু—সেই রকম কথা আছে বুঝি ?

—না, কোন কথাই নেই।

—তবে ?

—তবে আসবেন না। সরল মুখে বলেছিল প্রমিতা—না গাড়ি, না তিনি।

—আরে এ কথাটা আগে বলবি ত! বড়দা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রমিতার কাছে বসে বলেছিলেন—তা ক'দিনের ছুটি ?

—ছুটি ?

—হ্যাঁ রে, এখানে থাকার। তা ক'দিনের ছুটি দিয়েছে নিখিলেশ ?

—ক'দিনের ? মৃদু হেসে প্রমিতা বলেছিল,—যতদিন মরণ না আসছে ?

—কী অলুক্ষণে কথা! বিরক্ত-ক্ষুণ্ণ গলায় বলেছিলেন বড়দা—আবোল-তাবোল কী বকছিস বলত ?

ওষ্ঠে হাসি রেখেই প্রমিতা বলেছিল—ঠিকই বলছি।

—ঠিকই বলছিস ? ধমক না দিয়ে পারেন নি বড়দা।

—হ্যাঁ বড়দা, ঠিকই বলছি।

প্রমিতার দৃঢ় কথায় বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে বলেছিলেন—কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ?

—বুঝতে পারছো না, না বুঝতে ভয় পাচ্ছো! কোন্‌টা বড়দা ? হাসছে প্রমিতা!

একটা গর্তের মধ্যে তাকে ফেলে প্রমিতা যদি পাথর চাপা দিত, তা'ও সহ্য করতে পারতেন তিনি; কিন্তু মরণ তুলে কথা! প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন—হেঁয়ালী রাখ। খুলে বল সব ?

অনুচ্চ কণ্ঠে প্রমিতা পালটা প্রশ্ন তুলেছিল, এত বলার পরেও আর কী বলতে হবে বল ?

না, প্রমিতা ত আর হাসছে না। অমন চোখ অথচ চাহনিটা কেন এমন বিষাদ-করুণ। প্রমিতার এলিয়ে পড়া হাতটা এবার বৃদ্ধ

নিজেই তুলে নিয়েছিলেন। ঘরে এসেছিলেন এসময় মেজদা ক্ষিতীশবাবু—অফিসের পোশাকে। এক হাতে সেদিনের দৈনিক কাগজ, অন্য হাতে মধ্যাহ্নকালীন আহার্যবস্তু ভরা অ্যালুমিনিয়ামের ডিবা।

—তাহলে বড়দা, ধীর গলায় তিনি বলেছিলেন—এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ ?

—কীসের ভাই ?

—কীসের ? হাউ ফানি ! চেয়ারে বসে বলেছিলেন ক্ষিতীশবাবু —প্রমিতা কিছু বলে নি তোমায় ?

কেশশূন্য মাথায় হাত রেখে উত্তরটা দিয়েছিলেন বড়দা—যা বলছে, বড় দুর্বোধ্য। কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই।

—আরে, আমিও কী পেরেছিলাম নাকি ! ভাবলাম ভাইয়েদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে বুঝি। মেজবৌ যখন চোখে আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলে, শ্বশুরবাড়ির সমস্ত গহনা খুলে, আমাদের দেওয়া সুটকেশটা নিয়ে, ট্যাক্সিতে করে এসেছে এই সাত সকালে, তখনই ত বুঝতে পারলাম। তারপর অন্তুকে ডেকে ধমক দিতেই সে ব্যাপারটা ফরফর করে বলে ফেললে। তাই ত বলছি বড়দা, এখন করবে কী ?

বড় করুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ জানতে চেয়েছিলেন কী সে ব্যাপার ?

কানে গোঁজা খরকেটা নিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে নির্লিপ্ত গলায় সেদিন ক্ষতীশবাবু ব্যাখ্যা করেছিলেন—আমাদের বংশে যা কখন হয় নি, তোমার আদরের ভগ্নী তাই করেছে—অর্থাৎ কিনা নিজে থেকে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দিয়ে এখানে এসে উঠেছে। ব্যাপারটা কি—বুঝলে ত এবার।

বিস্ময়-বিদগ্ধ বড়দা সেদিন এমন এক দৃষ্টি মেলে প্রমিতার মুখের দিকে চেয়েছিলেন—যার একটি মাত্র অর্থ হল—যা শুনলাম তা কী সত্যি ?

—তাই ত বলছি বড়দা, কী করবে এখন ?

বড়দা নিশ্চুপ। এদিকে আবার অফিসের সময় হয়ে আসছে। ক্ষিতীশবাবু এবার প্রমিতাকে নিয়ে পড়েছিলেন—তুই কী রিটিন ডিক্লারেশন দিয়ে এসেছিস?

—হ্যাঁ। নিথর কণ্ঠে বলেছিল প্রমিতা।

—চমৎকার! যাদের বাড়িতে এসে ওঠা হল, ডিক্লারেশন দেবার আগে তাদের সঙ্গে একটা আলোচনা করারও প্রয়োজন হল না?

প্রমিতার দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে।

বোনের ভবিষ্যত ক্ষিতীশবাবুকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তিনি তাই বড়দার মতন চুপ করে থাকতে পারেন নি।

—কিন্তু তুই কি ঘুমোচ্ছিলি? জানতে পারিস নি আগে থেকে কিছু?

—না। নত মস্তকেই প্রমিতা কোন রকমে উত্তর দিয়েছিল।

—না? সুন্দর! স্বামী অন্য বাটীতে ঠোক্কর দিচ্ছে, আর স্ত্রী হয়ে তুই কী শিস দিচ্ছিলি? তা জানতে পারলি কখন?

—মেয়েটি ভারতে আসার পর যখন তিনি আমারই উপদেশ চাইলেন—কী করবেন? তখন।

—উপদেশ? ক্ষিতীশবাবুর হাসির দাপটে এই নোনা ধরা ঘরটা যেন তখনকার মত কেঁপে উঠেছিল। পরে বলেছিলেন—তখন থ্রেটনিং দিলি নে কেন? ক্ষিতীশবাবুর গলার স্বরটা ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠেছিল।

—জানা যখন গেল, নতনেত্রে বলেছিল প্রমিতা—তখন আজ সকালেই যা করে এলাম ঐটুকু আমার করবার ছিল।

—ইয়ার্কি! ছেলের হাতের মোওয়া! আইন নেই? কোর্ট নেই? তাড়িয়ে দিলেই হল!

বিহ্বল বড়দা কিছু করতে না পেরে শুধু রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির লোকদের ঠেকাতে পারেন নি। ক্ষিতীশবাবুর গলার আকর্ষণে ঘরের দরজায় রীতিমত ভিড়। কিন্তু আশ্চর্য! যাকে নিয়ে এত আন্দোলন সে ছিল নির্বিকার।

—মেজদা! এবার প্রমিতা চেয়েছিল সদীপ্ত দৃষ্টিতে—তোমার মুখ থেকেই ত কতবার শুনেছি, কাকারা বাবার দেশের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিলেন। আইন কোর্ট সেদিনও ত বাবার পক্ষেই ছিল।

—কোথায় পাড়াগেঁয়ে এঁদো মাটি আর কোথায় সব শাঁসাল স্বামী? দুই এক হল? এ বুদ্ধি না হলে এক কাপড়ে আসবি কেন?

—নিশ্চয়ই এক নয়, তবে আইনের কথা যে তুমিই তুললে।

—সব দিক বিবেচনা করে তুলতে হয়েছে তোর ভবিষ্যতের জন্যে। কী বল বড়দা! তা ছাড়া বাবা ছিলেন পুরুষ মানুষ—এক ডাল ছেড়ে আর এক ডাল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন—আর তুই! মহত্ত্ব দেখিয়ে শেষে কী আঙ্গুল চুষবি?

—দাঁড়ানো নিয়ে ত কথা! প্রমিতা এবার মৃদু হেসে বলেছিল—চেষ্টা থাকলে পুরুষ মেয়ে সকলের পক্ষেই সম্ভব।

—অসহ্য! অফিসের দেরি হওয়া সত্ত্বেও যার হিতের জন্যে বোকে মরা, তারই মুখে কি না আদর্শের বুলি!

—ও, তাই বল! সে লম্পটের মতন তোরও কারুর হাত ধরে দাঁড়ানোর প্ল্যান আছে তাহলে?

বড়দা ত এতক্ষণ বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে কেবল এদের মুখ চাওয়া-চায়ি করছিলেন, এবার তিনিও যেন তেতে উঠলেন—আঃ! ক্ষিতীশ, হচ্ছে কী এ সব? মেয়েটা সবে এল, এখন কোথায়—অন্যায়! ভারি অন্যায়!

—সত্যি কথা চিরকালই অন্যায় বড়দা। একটা স্কাউণ্ড্রেলকে সাপোর্ট করে পথে বসল—এখন কী আমায় তুমি হরিসংকীর্তন করতে বল?

বড়দা কী যেন বলবার চেষ্টা করেও চুপ করে গিয়েছিলেন। একটা থমথমে অবস্থার মধ্যে তখন সবাই। কিন্তু ক্ষিতীশবাবুকে পথে বসা বোনের ভাত কাপড়ের চিন্তা পেয়ে বসেছিল। বললেন—তাহলে তোকেই জিজ্ঞেস করি, কী করবি এখন?

—বলতে পারছ না। তবে বেশী দিন যে এ সংসারে বোঝা হয়ে থাকব না, তা বলতে পারি।

যত দূর সম্ভব সংযত ভাবে কথাটা বলেছিল প্রমিতা। কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর কাছে এটা যেন একটা বিদ্রূপ। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। —ও, তুই যে আমাদের বোঝা, বুঝে নিয়েছিস তাহলে ? শুনছ ত বড়দা ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে প্রমিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল—মেজদা, তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?

—অফিস ! এবার ফেটে পড়েছিলেন ক্ষিতীশবাবু—অফিস যাওয়া মানেই ত পাঁক মাখা ! মরণ না হওয়া অবধি—

শিউরে উঠেছিলেন বড়দা - কেন ভাই ?

—অফিস মানেই সমাজ। প্রমিতাকে লক্ষ্য করে বড়দাকে বলেছিলেন ক্ষিতীশবাবু—আমরণ ত এখন শুনতে হবে —বৌয়ের দোষ না থাকলে কোন শিক্ষিত স্বামী তাকে ত্যাগ করে ?

ছোট ভাই অন্তু ছিল এতক্ষণ পাশের ঘরে। দাদাদের কথায় থাকা উচিত নয়। কিন্তু ক্ষিতীশবাবুর মর্মবেদনা যেন তাকে এ ঘরে টেনে আনল—তোমার লজ্জা কী মেজদা ! লোকসমাজের আক্রমণ কাটাবার অস্ত্র ত তোমার নিজের হাতেই আছে।

—হচ্ছে আমাদের কথা, চোখ পাকিয়ে উঠেছিলেন ক্ষিতীশবাবু —তুই নাক গলাস কোন্ সাহসে ?

হাসি হাসি মুখে উত্তরটা দিয়েছিল অন্তু—নাক গলাতে আসি নি, এসেছি তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে। তোমার বিস্মৃতি ঘটছে কি না !

—কী বলতে চাস ?

—বলতে চাই, কোন বারেই ত ভাই ফোঁটার নিমন্ত্রণে প্রমিতার বাড়িতে পায়ের ধুলো দাও নি—কারণ সতাতো বোনের ফোঁটা, সে

আবার ফোঁটা নাকি! তোমার অফিস-সমাজ সেই বোনের চরিত্রদোষ যখন দেবে তখন অনায়াসে বল, সতাতো বোন আবার বোন নাকি! তোমার লজ্জা কী মেজদা!

একটা রীতিমত হৈ-চৈ উঠেছিল তখন। কিন্তু সকলের গলা ছাপিয়ে শোনা গিয়েছিল ক্ষিতীশবাবুর কণ্ঠস্বর—তুই ত প্রমিতার হয়েই বলবি রে। নিখিলেশের দেওয়া চাকরির ভাত যে তোর পেটে।

—তোমারও। চটপট কথাটা বলেছিল অন্তু—চাকরির টাকা বায়ো আনাই দিই সংসারে। তাই ত রেশনের ভাবনা ভাবতে হয় না তোমাকে। এ বাড়িতে তোমার মতই প্রমিতার থাকার অধিকার আছে। আয় প্রমি!

হাত ধরে অন্তু তখনই ঘরভরা লোকের মধ্য থেকে প্রমিতাকে নিয়ে নিজের ঘরে এনেছিল।

অন্তু-প্রমিতা যাওয়ার পর ক্ষিতীশবাবু তখনকার মত অফিসে গিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দার কাছে তার আলটিমেটাম রেখে গিয়েছিলেন—কুলাঙ্গারণী বোনের ব্যাপারে তার কাছে কেউ যেন কিছু আশা না করে ভবিষ্যতে।

বাড়িতে বৌয়েরা যে যার কাজে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘরে কেশহীন মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বড়দা শুধু বলেছিলেন—ঈশ্বর, তুমি ওর ভালো কর!

বৃদ্ধের সে প্রার্থনা অন্তু না প্রমিতার উদ্দেশ্যে বোঝা গেল না।

প্রমিতা দেখছিল কালো মেঘগুলো কেমন করে সমস্ত আকাশ কালিবর্ণ করে তুলছে। এই ত কিছুদিন আগে যেখানে চলছিল রুক্ষ সন্ন্যাসীর তপ-সাধন সেখানে আজ রসধারার সমারোহ। রিক্ত হয়েই পূর্ণ হবার অন্তহীন খেলা।

—কি দেখছিস? অন্তু এল প্রমিতার চা নিয়ে।

—দেখছি, কী ভীষণ শুষ্কতার পরেই কী ভয়ঙ্কর সজলতা। বাইরে চোখ রেখেই বলল প্রমিতা—অথচ দুটোর কোনটাই চিরকালের নয়।

—তোর চা কিন্তু রোজ ওপরে আনতে পারব না। প্রমিতার দার্শনিক তত্ত্বকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল অন্তু।

—বয়েই গেল।

—গিলবি কী ?

—গিলব না।

—অন্য সময় ত নীচে নাবিস, সকালে কী হয় তোর ?

জবাব না পেয়ে অন্তু ধমকাল—বল ? সকালে কী তোকে ভূতে পায় ?

অন্তুর ধরা চা-টা নিয়ে সরল মুখে বলল প্রমিতা—দেখতে পাস না, আমাকে দেখলেই বড়দা কী রকম যেন হয়ে যান।

সদীপ্ত বোনের এই নেতিয়ে পড়া ভাবটা অন্তুর অসহ্য। গোছানো ঘরটা আবার গোছাতে লেগে গেল। এদিকে ৯টা বাজল ঘড়িতে।

—কী রে, এখনও তুই যে খেতে গেলি না ? অফিসের কথাটা প্রমিতা স্মরণ করিয়ে দিল অন্তুকে।

—আজ আর যাব না।

তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করল প্রমিতা—কেন রে ?

—এমনি।

হেসে উঠল প্রমিতা—এমনি ! কোন কারণ নেই ?

কী উত্তর দেবে অন্তু ! আর উত্তর দেওয়া মানেই ত ঝড়ে ভাঙা গাছকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া।

এগিয়ে এল প্রমিতা। প্রায় অন্তুর সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে শুধু বলল—কাওয়ার্ড !

—আমার অবস্থায় পড়লে তুই কী করতিস ?

—যেতাম অফিস। অন্তুর দুই কাঁধে হাত রাখল প্রমিতা—যে কারণে তুই আজ গা ঢাকা দিলি, কাল যে সেটাই আরো বিশ্রিভাবে তোকে চেপে ধরবে। ভেবে দেখেছিস কী ?

জানালার কাছে সরে এসে প্রমিতা আবার বলল—ছোটদা, ধরে নে না কেন, সংসারে সাধারণ ঘটনার মতই এও একটা !

—ধরতে যে পাচ্ছি না। প্রায় ভেঙ্গে পড়া গলায় বলল অন্তু—যখনই তোকে দেখছি, তখনই—

প্রমিতা কী চাবুক খেল! নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল—কী দেখছিস আমাকে? করুণাপ্রার্থী একটা সচল মাংসপিণ্ড! না রানীর রূপান্তর কাঙালিনীতে! কোন্‌টা?

প্রমিতার এ ভয়ঙ্কর মূর্তি অন্তুর অদেখা। শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল শুধু।

—দুটোর কোনটাই নয়। প্রমিতা যেন ফিরে এল স্বাভাবিকত্বে। প্রসন্ন কণ্ঠে বলল—জানিস ছোটদা, মীরা নাকি তাঁর দেবতার রূপ কল্পনার মধ্যে পা দুটো কখনও আনেনি—পাছে তার দেবতা পালিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার প্রিয়জনের পালাবার অঙ্গ আছে জেনেও তাকে নিয়েই তার সাধনা, তার সংসার, ভালবাসা, এমন কি বাপ হওয়া-মা হওয়া। এটা যদি মনে রাখিস ত দেখবি, তোর প্রমির জন্যে কোন দুঃখ থাকবে না। যা ভাই, অফিস যা?

—আজ কী আমায় রেহাই দিতে পারিস নে? ধরা গলায় ভিক্ষা চাইল অন্তু।

অন্তুর এই ভেঙ্গে পড়া ভাবটা প্রমিতার রক্তে যেন আগুন ধরাল! কষ্টের সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল এক সময়—পাচ্ছিস না বুঝি আজকের এই ১২ই শ্রাবণকে মেনে নিতে? কিন্তু একটা দিন ত বেশ অফিস করে এলি! কথা শেষ করেই হেসে উঠল প্রমিতা, যেমন হাসত অকারণে রেনী পার্কের বাড়ির বারান্দায় অন্তুর সঙ্গে চা খেতে খেতে অনেক সন্ধ্যায়।

—ও বুঝেছি। "আজ আপনার ভগ্নিপতির নাকি বিয়ে?" অফিস মেটদের এই প্রশ্নের ভয়ে আত্মগোপন? বীরপুরুষ! যে কাজের কোন প্রবঞ্চনা নেই—এবার গম্ভীর হল প্রমিতা—সে কাজের জবাবদিহিরও কোন লজ্জা নেই।

—প্রবঞ্চনা নেই? যেন রুখে উঠল অন্তু।

—না নেই। তৎপর জবাবটাও দিল প্রমিতা।

—বলছিস কি? তার দিক থেকেও?

এ'কদিন অন্তু গুমরে গুমরে অনেক সহ্য করেছে, কিন্তু এইবার যেন অপারক হল। তিক্ত গলায় বলল—শুধু আজকের দিনটা কেন, তারই দেওয়া চাকরি ভবিষ্যতে যদি করতে না পারি, বোনের প্রতি নির্লজ্জ প্রতারণার বিপক্ষে তবু আমার একটা জেহাদ থাকবে তার বিরুদ্ধে। হয়ত কিছুটা সান্ত্বনাও পাব।

স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রমিতা শুধু চেয়ে রইল। ছোটদা! তার ভাই-বন্ধু! এসব বলছে কি আজ? যার একটা হাত তারই পরিচর্যায় নিযুক্ত সকাল সন্ধ্যে, অন্য হাতটা অল্প রোজগারি দাদাদের অভাবি সংসারটা ধরে রয়েছে—তারই মুখে চাকরি-ইস্তফার কথা—এই দুর্মূল্যের বাজারে? আশ্চর্য কী! যে উত্তাপে বাসুকিও মাথা চাড়া দেয়, সেই তাপে সদাপ্রসন্ন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ সংযত সত্তা—আজ বুঝি ক্ষিপ্ত!

অন্তুকে ধরে খাটে এনে বসাল প্রমিতা। বলল এক সময়—তুই যখন কথাটা তুললি ছোটদা, তখন বলি, বাইরে থেকে এটাকে প্রতারণা দেখালেও, আসলে কিন্তু তা নয়।

—থাক!

—শোন ছোটদা, অজানা তোর কিছুই নেই, তবু জেনে রাখ, অবস্থা বিশেষে অতি সজ্জন লোকও প্রতারক হয়। স্বভাবপ্রতারক যদি সে হত, তাহলে মেজদা যা চায়, সেই আমার ভাত কাপড়ের দাবি, আদায় করে ছাড়তুম। কথাটা কী জানিস, তার বিপক্ষে নালিশ করবার মতন কোন মাল-মশলা আমার হাতে নেই।

কথা শেষে প্রমিতা অন্তুর হাতে নিজের হাতটা বুলাতে লাগল।

জঘন্য বিপর্যয়ের এই নির্লিপ্ত উপসংহার—অন্তুর কিন্তু মন ভরলো না।

—কিন্তু এই ভাবে এক কাপড়ে চলে আসার একটা অর্থই দাঁড়ায়—তা হল—

—জানি। অন্তুর চিত্তপীড়ন আর বাড়তে দিল না প্রমিতা—

দেখায় ঠিক যেন ব্যভিচারিণীর প্রায়শ্চিত্ত। জানি ছোটদা, সব জানি—এও জানি মরণ আসা অবধি তাই শুনতে হবে।

শেষের দিকে প্রমিতার গলাটা যেন ভারি ঠেকল। আলোচনা পালটাতে চাইল এখন। কিন্তু বোনের এই নিরাসক্ত চাহনি, দেহের এই কঠিন নিশ্চলতার কাছে কোন কথাই জোগালো না অন্তুর মুখে। একটা দমকা হাওয়ার পরই বৃষ্টি এল ঝম-ঝমিয়ে।

—স্বামীর যখন অসুখ করে, জলঝরা আকাশের দিকে চোখ রেখেই প্রমিতা এক সময় বলল—তাকে সুস্থ করে তুলতে স্ত্রী রাস্তায় দাঁড়াতেও পেছপা হয় না। কেন না, স্বামীর তখন জীবনসমস্যা। কিন্তু সুস্থ স্বামীর যখন সেই সমস্যা দেখা দেয়—বুঝতে পারলি নে বুঝি? আয়ুর সমস্যা নয়, সম্মানের। পুরুষের জীবনে আয়ুর চাইতেও যার দাম বেশী—সেই স্বামী-সম্মান রাখতে স্ত্রীকে তার স্ত্রীত্ব প্রত্যাহার করা ছাড়া আর যদি কোন পথ না থাকে—এইবার তুই বল ছোড়দা, তখন কী আর ভবিষ্যতের ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা জলাঞ্জলি দেবার জন্যে হাত পেতে টাকা ভিক্ষে করা যায়—না লোকের কাদার ভয়ে স্বামীকে জীবন্মৃত করে রাখা যায়? প্রমিতার আঁখিপল্লব জলভারে টলটলিয়ে উঠল।

প্রসঙ্গটা পাল্টানো দরকার। অন্তু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তোর কথামত আমি কিন্তু খোঁজ করছি—তুইও কাগজ দেখতে ভুলিস নি। কীরে?

অন্তুর হাতে নাড়া খেয়ে আচমকা প্রমিতা বলল—কী বল ত?

—বারে, মাষ্টারনীর বিজ্ঞাপন।

কিন্তু প্রমিতার ভাবান্তরের কোন লক্ষণই পেল না অন্তু। সেই উদাস দৃষ্টি, সেই নিবিড় নিশ্চলতা। তিন দিন হয়ে গেল প্রমিতা এসেছে এ বাড়িতে। এটা সত্যি, ওর মধ্যে কোন সজীবতা পায়নি বটে, কিন্তু এমন প্রাণদৈন্যের লক্ষণ ত দেখেনি অন্তু এর আগে! উঠতে যাবে, শুনল, প্রমিতা কী যেন বলল তাকে।

—কিছু বললি?

—জেহাদ হিসেবে তুই নাকি চাকরি ছেড়ে দিবি?

—যদি তাই করি?

--তুই কীরে ছোটদা?

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অন্তু। প্রমিতা হাসি ভুলে যায়নি তাহলে?

—কী মনে হয় তোর?

—মনে হয় গোঁফদাড়ি ওঠা একটি শিশু।

—তাহলে গোঁফদাঁড়ি ওঠা সব পুরুষই তোর কাছে শিশু? একটু যেন রুখে উঠল অন্তু—আমি যা করতে যাচ্ছি, এ অবস্থায় সব পুরুষই তাই করত।

—না করত না। উত্তরটা যেন প্রমিতার ঠোঁটের আগায় ছিল।

—তুই কি বুঝবি! অন্তু উঠে পায়চারি শুরু করল। এক সময় প্রমিতার সামনে এসে বলল—যাই বলিস, যাঁর জন্যে আমার বোনকে শাঁখা খুলতে হল, তাকেই সারা জীবন মনিব করে, তারই বদান্যতায় দুবেলা পেটে ভাত দেওয়া পুরুষের জীবনে অভিশাপ। কী জানিস প্রমি—

কথাটা শেষ করতে গিয়েও শেষ করতে পারল না অন্তু।

যে-বিদঘুটে ভাবটা একটু আগে ভূতের মতন প্রমিতাকে চেপে ধরেছিল এ যে আবার তারই সূচনা। না, আলোচনাটা গোড়ায় চাপা দেওয়া তার উচিত ছিল।

—ছোটদা?

চমকে উঠল অন্তু। এমন কোমল করুণ ডাক এ বাড়িতে এসে অবধি ডাকেনি প্রমিতা।

—বল? অন্তু প্রমিতার হাত ধরল।

—তাই যদি করিস, তাহলে এ বাড়ির লোকেরা খাবে কী, যাবে কোথায়? আয়তলোচনা সকরুণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে, তখন শেষ করাই উচিত। সোজাসুজি বলল অন্তু—যদি আমার চাকরি না থাকত?

—যদি ? কে যেন প্রমিতাকে দাঁড় করাল। দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—এটা আক্ষরিক শব্দ শুধু, অতীত আর ভবিষ্যত ব্যাপারে চলে। বর্তমানে যদি কিছু নেই। তা ছাড়া তুই যাকে জেহাদ বলছিস, তা চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসার মধ্যে নেই।

—তুই একে পালানো বলিস ?

—তাই বলি। বোনের অপমানের বিরুদ্ধে চাকরি ছেড়ে সগুষ্টিকে উপোসী রাখার মধ্যে জেহাদ নেই, বরঞ্চ ধরে থাকার মধ্যেই তা থাকে। তুই যদি তোর নিষ্ঠায় আর সততার মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিস, যদি প্রমাণ করে দিতে পারিস, তুই অফিসের একটা অঙ্গ বিশেষ—এই একটু আগে যা বললি, যার বদান্যতায় তোর অন্ন জুটছে, সেই তখন তোকে দেখবে শ্রদ্ধার চোখে। তখন কার বদান্যতায় খেতে পাচ্ছি সে প্রশ্নই আর উঠবে না।

ঘরে এল বড়দার মেয়ে রাণু হুড়মুড় করে।

—পিসি, তোমার চিঠি।

—আমার ?

—এই দেখ না তোমারই নামে।

চিঠিটা প্রমিতার হাতে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমন করে ছুট দিল রাণু।

চিঠিটা আসছে রেনীপার্ক থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে। খামটা খুলতেই প্রমিতার যেন ঘোর লাগল "পরম শ্রদ্ধেয়া"। এ সম্ভাষণ কে করবে তাকে ?

—কে লিখেছে রে ? প্রমিতার বিহ্বলতা লক্ষ্য করে অন্তু জানতে চাইল।

—ধরতে পারছি না। চিঠিতে চোখ রেখেই বলল প্রমিতা। চিঠির আদ্যপ্রান্ত পড়ার ধৈর্য যেন নেই। নিমেষে চোখটা নামিয়ে আনল একেবারে ইতিতে—"কালো ডাক্তার"।

কালো ডাক্তার ! অপার্থিব শিহরণে প্রমিতা যেন কেঁপে উঠল একবার। চিঠিটা ধরাই রইল হাতে। শাশুড়ির এমন কোন

চিঠিই পায় নি—মনে পড়ল প্রমিতার, কালো ডাক্তারের কথা না লিখেছেন।

—ধরতে পারলি ? প্রমিতার কথার জের টানল অন্তু। প্রমিতা এবার চিঠিটা ধৈর্য ধরে পড়ল একবার দুবার, তিন বারেরবার অন্তুই অধৈর্য হল—কীরে ? চিঠিটা কি মুখস্ত করবি ?

—ছোটদা, এখন ক'টা বেজেছে বলতে পারিস ? প্রমিতা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে।

—দার্শনিক হলি কবে থেকে ?

—আঃ, বল না ?

—সামনে থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে ?

দেয়াল ঘড়িতে চোখটা রেখে প্রমিতা কি যেন হিসাব করল। বলল—ভালই হয়েছে, তুই যখন অফিস যাবি না আজ তখন আমায় একটু সাহায্য করবি ?

—যথা ?

—আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবি ?

—ট্রেনে ?

—হাঁ রে।

—যাবি কোথায় ?

—কাশী।

—মানে ?

—মানে বেনারাস ! ইংরেজী করে না বললে তুই ত আবার বুঝতে পারিস না।

—তামাসা রাখ। কী ব্যাপার বল ?

—তা-মা-সা ! পুনরুক্তি করল প্রমিতা কথাটা টেনে টেনে, —তামাসা ত এতদিন চলল—এবার যদি দেখতে পাই আমার—। তুই ভাই স্নান খাওয়াটা সেরে নে আমি এদিকে গুছিয়েনি।

—কিন্তু কেন যাবি জানতে পারি না ? উঠে দাঁড়াল অন্তু।

—অসুখ ! মা—মানে শাশুড়ির। এই দেখ চিঠি।

—থাক! রুখে উঠল অন্তু—তার অসুখ, তোকে যেতে হবে কেন?

হেঁট হয়ে খাটের তলা থেকে বড় সুটকেশটা টেনে আনছিল প্রমিতা। উঠে এসে সামনে দাঁড়াল অন্তুর।—কারণ, যার চিন্তায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—দৃঢ় দীপ্ত গলায় বলল প্রমিতা—চিকিৎসা বিধানে বলছে, তারই উপস্থিতি নাকি ওষুধের চেয়েও বিশেষ জরুরী রোগীর পক্ষে।

—কিন্তু সেটা ত আর কেউ হতে পারে? যেন চোখে আঙুল দিয়ে প্রমিতার ভুলটা দেখিয়ে দিতে চাইল অন্তু।

সরলভাবে উত্তরটা দিল প্রমিতা—কিন্তু চিঠিটা ত আসছে আমার নামে।

—ও, সেই জন্যে তোকেই ছুটতে হবে মলমূত্র ফেলবার জন্যে। কটূক্তি করল অন্তু—আর তার ইঞ্জিনিয়ার পুত্র থাকবে তার বিদেশী ভার্যা নিয়ে স্বধামে। চমৎকার!

—ছোটদা! একটা বিদীর্ণ স্বর বেরিয়ে এল প্রমিতার গলা দিয়ে। নিজেকে সামলে বলল এক সময়—তোর ইচ্ছে এই ত সুযোগ—ছেলেকে যে রুখতে পারল না, বিনা সেবায় সে বুড়িটা মরুক না কেন? ছোটদা, সংসারে সাঙ্ঘাতিক যা, সেই মানুষ হত্যা, আইনে সেই হত্যাকারির শাস্তি আছে কিন্তু পৃথিবীর কোন্ আইনে দেখেছিস হত্যাকারির বাপ-মাকে শাস্তি পেতে হয়েছে? তা ছাড়া তিনি যা চেয়েছিলেন আমার কাছ থেকে দিতে পারলাম কৈ? দেখি যদি এবার—প্রমিতার শেষ কথাক'টি যেন হতাশার ইঙ্গিত।

অন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিল। সহানুভূতি জানাল—কী দিতে পারলি না?

কতক্ষণ যে প্রমিতা অন্তুর মুখের দিকে চেয়েছিল নিজেই জানে না। বলল এক সময়—তুই ভাই, তোকে বলি কি করে? এখন নে, রেডি হ! আমি গুছিয়ে নি!

—কিন্তু এত তাড়া কিসের? কাশীর ট্রেন ত সেই সন্ধ্যেতে।

আলনা থেকে শাড়িটা পাট করতে করতে বলল প্রমিতা—কেন দুপুরের দিকে একটা আছে যে ?

সেটা ট্রেন নয়—গরুর গাড়ি। তোকে সন্ধ্যের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব'খন।

—সন্ধ্যে! আঁতকে উঠল প্রমিতা—সকাল যাবে, দুপুর যাবে, বিকেলও যাবে—তারপর সন্ধ্যে? ছোটদা, ততক্ষণে বোধ হয় আমি মরে যাব! আজ কলকাতার সন্ধ্যে আমায় দেখতে বলিস নে ভাই—তোর পায়ে পড়ি!

শেষের পরেও শেষ যেটি—সেটি নব-দম্পতির স্বাস্থ্য পান। প্রারম্ভে তো দিয়ে শুরু, অন্তে তারই মাধ্যমে শেষ।

শহরের অন্যতম অভিজাত হোটেলে সংরক্ষিত সুসজ্জিত কক্ষে অভ্যাগতেরা শেষ পাত্রটি যখন একে একে ওষ্ঠ হতে নামালেন, ঘড়িতে তখন ইংরাজী মতে পরবর্তী দিনের দশ মিনিট অতিবাহিত হয়ে গেছে। এটাই নাকি আন্তর্জাতিক বিবাহ অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ কৌলিন্য। যে দিনটিতে দুই ভিন্নহৃদয় যুক্ত হল—যার আয়ুষ্কাল এই মাত্র দশ মিনিট আগেও ছিল—সেদিনটি যে অনন্য, মদিরা সেবনের দ্বারা তাকেই চিহ্নিত করা। পরবর্তী দিনটি—যার শুভাগমন ঘটল—মদিরার মাধ্যমে তাকেই অভ্যর্থনা—সে যেন নব-দম্পতির অভিন্ন হৃদয়টিকে মধুরতম উজ্জ্বলতম এবং গাঢ়তম করে তোলে।

পানপর্ব শেষে শুরু হল প্রীতি আর সৌজন্যের দেওয়া নেওয়ার খেলা নব-দম্পতিকে মধ্যস্থ করে ফুলের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সঙ্গীত—"উয়ী শুড এনজয় অ্যাট দি বেস্ট, হ্যাণ্ডিং এ টাই বিটুইন ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট" অনবদ্য সুরে ধ্বনিত হল। সাথে সাথে চলল ক্যামেরার তৎপরতা, হর্ষধ্বনি, করতালি।

নিখিলেশের একান্ত হয়ে মিসেস মিত্র বিলোল কটাক্ষে বললেন, —বাসর সঙ্গীত গাইলাম—রাত জাগানির টাকা চাই কিন্তু?

কলকণ্ঠে সমর্থন করলেন অন্যান্য মহিলারা—যাঁরা না বুঝলেন তাঁরাও।

ভিড় ঠেলে এ সময় দেখা গেল এগিয়ে আসতে মহিলা রত্নের কোহিনূর মিস সিন্‌হাকে। দুধ-বরণ সিল্কের শাড়ি পরণে—সেই কাপড়ের জামা—যতটুকু ভার বওয়া যায় ঠিক ততটুকু। গলায় শ্বেত-মুক্তার মালা। শিথিল কবরীতে কিছু রজনীগন্ধা। পায়ে সাদা নাগরা। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোন্ সংখ্যাটি অনুমান-সাপেক্ষ। এই কিছুদিন আগেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল ব্রিফ হাতে হাইকোর্ট বারে। সেটা অর্থের জন্য যত নয়—যত প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্য। অন্যান্য আইনজীবীদের অন্তরস্থলে ঈর্ষাগ্নি প্রজ্বলিত করেই কিন্তু আর পা দেননি বিচারশালায়। বর্তমানে অখণ্ড প্রতাপে সমুজ্জ্বল ব্যবসা-গগনে—বিশেষতঃ রপ্তানি ব্যাপারে। সম্প্রতিকালে এক প্রেস কনফারেন্সে তাঁর মন্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ভারতের সর্বপ্রান্তে "একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বারাই দুঃখী ভারতমাতার দুঃখ বিলোপন সম্ভব।" লৌহ রপ্তানির কাজে তাঁর অপরিসীম দক্ষতায় ভারত সরকার বিস্মিত, উপকৃত।

—কর কি তোমরা? কৃত্রিম রোষে বললেন মিস সিন্‌হা।

—এদের কি ছুটি দেবে না—এদিকে চাঁদ যে লুকলো বলে।

মিস সিন্‌হা সমর্থিত হলেন সর্বসম্মত ভাবে।

এবার করমর্দনের দ্বারা শুভরাত্রি জ্ঞাপন।

নিখিলেশ সরকার হাত বাড়াল। কিন্তু সম্ভব নয় এক স্থানে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কর-বিনিময়। স্বামীর পার্শ্বচ্যুত হলেন আয়ানভন হীচি—বর্তমানে মিসেস সরকার, পিতা-মাতার কণ্ঠে মাত্র একটি অক্ষরে যিনি আজন্ম সম্ভাষিতা 'লী', ঘুরে ঘুরে করমর্দন করলেন সবার সঙ্গে স্মিতহাস্যে। লাল শাড়ি পরিবৃতা, রক্তগোলাপ-বর্ণা দীর্ঘাঙ্গীর মৃদু পদসঞ্চারণে অকস্মাৎ আর একজনের হৃদয়গভীরে বিস্মিতপ্রায় এক সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হল।

অত্যুজ্জ্বল আলোশোভিত, হর্ষোৎফুল্ল নর-নারীর মধ্যে বিপরীত-

ধর্মী এ সঙ্গীত মূর্চ্ছনা কেন? বৈজ্ঞানিক নিখিলেশ সচেতন হল কারণ অনুসন্ধানে। একি স্নায়বিক দৌর্বল্য? না বিশেষ পানীয়ের সাময়িক প্রতিক্রিয়া? কিন্তু এ দুটোরই ত সে মূর্তিমান প্রতিবাদ।

এই ত গতকাল পর্যন্ত সমানে পরিশ্রম করেছে ওয়ার্কশপে আট ঘণ্টা। দেহের শক্তিসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনে নিত্য পান করে আসছে সেই বিশেষ পানীয় এক নাগাড়ে সাত বছর। স্মরণে ত আসে না সে পানীয়ের দাসত্ব করেছে কোনদিন! তবে? কাঁধ দুটি শ্রাগ্ করে স্থান পরিবর্তন করল মেটারলজিস্ট।

পায়ে পায়ে হলের মোটা পর্দা সরিয়ে কখন যে নিখিলেশ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারল বর্ষণ-শীতল হাওয়ার স্পর্শে। বন্ধ ঘরের আবহাওয়া যেন বড় বেশী উত্তেজক—রক্ত সঞ্চারণে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য ঘটায়। আঁধারঘেরা মুক্ত এই জায়গাটি যেন বৈশাখের তাপ-দগ্ধ প্রান্তের মাঝে বট অশ্বত্থ ঘেরা ছায়া-শীতল আশ্রয়। স্নিগ্ধ স্পর্শে চোখ আসে আপনা হতে বন্ধ হয়ে। তন্দ্রালু নিখিলেশ শিহরিত হল তড়িৎ-স্পর্শে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখল এপাশ ওপাশ।—কিন্তু কোথায় কে? "তুমি ক্লান্ত, মাথা টিপে দেব?" পাক-স্পর্শের উৎসব অন্তে নিভৃত কক্ষে স্তিমিত আলোর তলায় দাঁড়িয়ে লাল বেনারসী পরা গৌরাঙ্গীর সুমধুর কণ্ঠের সেই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি আসে কোথা থেকে? স্থান-কাল-পাত্র বিস্মিত ইঞ্জিনিয়ার চেয়ে রইল নিঃসীম অন্ধকারে।

লীলায়িত ছন্দে প্রবেশ করলেন মিস পাকড়াশী। বিলোল কটাক্ষ হেনে বললেন—কুঞ্জ আঁধার করে এখানে যে একলা বড়? ওদিকে শ্রীমতীর যে মরণদশা!

দেহ-ভার এক রকম নিখিলেশের পরে রেখেই ফিরে এলেন হলে মিস পাকড়াশী। ক্ষণেক অনুপস্থিতির অপরাধ হেতু অভিযোগ অনুযোগের ঢেউ এসে পড়ল নিখিলেশের গায়ে। আবিষ্কারের উল্লাসে মিস পাকড়াশী পেগ টেবিলে কি যেন অনুসন্ধান করলেন। সব গেলাসই শূন্য তখন। অতৃপ্তিসূচক একটা অদ্ভুত ধ্বনি বেরিয়ে এল তাঁর শুষ্ক গলা দিয়ে।

এতক্ষণে শেষের শেষ। প্রমত্ত উল্লাসে বেরিয়ে এলেন সবাই দম্পতিকে ঘিরে। রাস্তায় অপেক্ষমান গাড়িগুলি এগিয়ে এল একের পর এক। একই ভাষা, একই রীতি এবং একই অঙ্গসঞ্চালন চলল বেশ কিছুক্ষণ।

গাড়িতে পা রেখেই আবার ফিরলেন মিস সিন্‌হা। স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ললিত কণ্ঠে বললেন—কবে আবার খাওয়াচ্ছো বল ?

—কবে চান বলুন ? স্মিত হাস্যে জানতে চাইল নিখিলেশ।

—আরে, কারণ না জেনেই খাওয়াতে চাও ?

—আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ওটাই ত কারণ। উত্তরটা দিল সুভাষিণী মিসেস সরকার।

—গ্রাণ্ড! সহাস্যে বললেন মিস সিন্‌হা—নিখিল, তুমি শুধু লক্ষ্মী লাভ করনি, বাগদেবীও লাভ করেছ। আরে, খাওয়ার কারণ হল, এতক্ষণ ত জনতার অত্যাচার চলছিল তোমাদের ওপর, কত সহজেই না মুক্তি দিলাম।

স্বামী-স্ত্রীর আরো নিকটবর্তী হয়ে স্মরণ করিয়ে দিলেন মিস সিন্‌হা।

—আজকের রজনীর দণ্ড-পল-মুহূর্ত যে বড় বেশী দ্রুতগতি। দু-হাতের দুই আঙুল দিয়ে নিখিলেশ লীর গণ্ডদেশে মৃদু নক করে গাড়িতে উঠে শ্বেতবসনা বললেন—টা--টা!

এবার দেখা গেল মিস পাকড়াশীকে—যেন রেসে ছোটা ঘোড়া—ক্লান্ত বিবর্ণ।

—লাক! নিখিলেশের কাঁধে হাতটা রেখে বললেন তিনি—সরকার, সবাই বলছে তুমি লাকি। কিন্তু কি জান, লাক জিনিসটা যেন কুড়িয়ে পাওয়া, যেন কারুর দেওয়া দান। নিজের বাহাদুরী কিছু নেই ওতে। আমি বলি, ফরচুন—যা আয়ত্ত করতে হয়। তুমি হিমালয়ান ফরচুন বিল্ট করেছো। তুমি—শেষের দিকে একটু ভাবোচ্ছ্বাসে কেমন যেন হয়ে পড়লেন তিনি।

—আপনি যাবেন কিসে ? জানতে চাইল নিখিলেশ।

—যাওয়া? স্বপ্তিম চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে উদাস কণ্ঠে বললেন মিস পাকড়াশী—শুধু যাওয়া, শুধু আসা, শুধু—

ব্যস্ত হলেন মিসেস সরকার—আমাদের কোন্ গাড়ি?

ততক্ষণ নিখিলেশের ইঙ্গিতে তার ছোট হিলম্যানটা এগিয়ে এসেছে। নিখিলেশ লীর সাহায্যে তিনি উঠে বসলেন গাড়িতে। গাড়ি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সাথীহীন বিগতযৌবনা মিস পাকড়াশীকে নিয়ে।

সবশেষে এসে দাঁড়াল সদ্য কেনা ভ্যানগার্ড। হোটেল দরওয়ান সম্ভ্রমে দরজা খুলে দাঁড়াল এক পাশে।

মাত্র বছর খানেক আগে যে বীজ রোপন করা হয়েছিল সাগর পারে এক কুমারীচিত্তে, তারই শ্যামচিক্কণ অঙ্কুরোদ্গম ঘটল এ' পারে বর্ষণসিক্ত বারই শ্রাবণ রজনীতে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল উলুহীন, শঙ্খধ্বনিবিহীন, আত্মীয় কলকণ্ঠ রহিত, ভৃত্য পরিবেষ্টিত আলোকোজ্জ্বল রেনী পার্কের সুরম্য প্রাসাদ-ভবনে।

বেনারসগামী অসংরক্ষিত যাত্রী বোঝাই কামরায় এক কোণে বসা প্রমিতা তখনও প্রহর গুনছে—কাশী আর কতদূর!

নতমস্তকে সুধাময়ীকে প্রণাম করে প্রমিতা উঠে দাঁড়াল। সুধাময়ীর চাহনিতে কোন চাঞ্চল্য দেখা দিল না। দৃষ্টি রইল নিথর নিস্পন্দ। সে চাহনি আনন্দের কি ব্যথার, অনুতাপের কি অনুশোচনার—বাইরে তার কোনটারই প্রকাশ পেল না বিন্দুমাত্র। ভাবময়ী তিনি—কিন্তু স্বভাবে গম্ভীরা। হাত বাড়িয়ে প্রমিতাকে যেমন তিনি বক্ষলগ্ন করে অন্তর-বিদীর্ণ ব্যথার উপশম করবার কোন চেষ্টাই করলেন না—অশ্রুজল ফেলে তেমনি প্রাক্তন পুত্রবধূর দুর্ভাগ্যের সমবেদনাও জানালেন না।

কিন্তু সে চাহনি অবিমিশ্র হলেও সূক্ষ্মতম অনুসন্ধান তাতে ছিল

বৈকি। কিন্তুর্থ ব্য হল সে প্রচেষ্টা। ও মুখ ত তেমনি—যেমন তিনি শেষ দেখে এসেছিলেন আট বছর আগে কলকাতা ছাড়ার দিন। বরঞ্চ কিছু যেন পুরন্ত—তিনি ভালবাসেন যা।

—এখন কেমন আছেন মা? নিঃশব্দতা ভঙ্গ করল প্রমিতাই।

—তুমি কেমন আশা কর, মা? সুধাময়ীর কণ্ঠে ব্যথার আভাষ।

নিমেষে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল প্রমিতা—জানালাটা খুলে দেব?

—দাও।

জানালা খুলতেই এক ঝলক রোদে ঘরটা ভরে উঠল। নিচেই উত্তরবাহিনী বয়ে চলেছে দুকুল ছাপিয়ে। গঙ্গার এমন প্রাচুর্যময়ী রূপ দেখেনি প্রমিতা এর আগে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল আলোক-উজ্জ্বলা কল-কল্লোলিনীর দিকে।

এইবার সুধাময়ী দেখলেন প্রমিতাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে। সিঁথিতে সিন্দুরের অনটন ঘটেনি। তাঁরই দেওয়া হাঙ্গরমুখো বালা হাতে। যে মটরমালা দিয়ে তাঁর শাশুড়ি তাঁর মুখ দেখেছিলেন বধু-বরণের সময়—কলকাতা ছাড়ার দিন সেই কুল-অলঙ্কারটি পরম আদরে পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পুত্রবধূর গলদেশে—সেটি তেমনই ত রয়েছে স্বস্থানে স্বমহিমায়। এক নীলষষ্টির দিন নকুলেশ্বর ফেরত ফিকে গোলাপী পাড়ের তসরের শাড়ি কিনে প্রমিতার হাতে তুলে দিয়ে যে ইচ্ছাটি সেদিন তিনি প্রকাশ করেছিলেন "দেবস্থানে যখন যাবে বৌমা, এটি পরে যেও"—সে ইচ্ছাটির যথার্থ ই মর্যাদা দিয়েছে প্রমিতা। কাশীতে আসার উপযুক্ত শাড়িই পরেছে। সম্পর্ক-বিচ্ছেদ হেতু আত্ম-অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ রাখার দম্ভে তাঁর দেওয়া কোন উপহারটির প্রতি অসম্মান দেখানোর কোন চিহ্নই ত পেলেন না ওই বাতায়নবর্তিনীর অঙ্গে। বহু প্রয়াসে একদিন যাকে তিনি ধরে রেখেছিলেন—হার মানলেন সম্পূর্ণ ভাবে। গণ্ড বেয়ে নেমে এল রুদ্ধ অশ্রু বড় বড় ফোঁটায়। ঘুরে দাঁড়াল প্রমিতা এক সময়। সুধাময়ীর অশ্রুজল এই বোধ হয় প্রথম দেখল সে। কিন্তু কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ করল না। খাটে বসে সুধাময়ীর শীর্ণ পায়ে হাতটা রাখল প্রমিতা।

—কাশীতে বাস করলে কোন ব্যথা, কোন অনুশোচনা থাকে না একথা ত আপনি একবার চিঠিতে লিখেছিলেন, মা।

—বড় ভুল লিখেছিলাম। অশ্রুমথিত গলায় বললেন সুধাময়ী —আজও ওদুটো যখন আমার আছে তখন আমার কাশীবাস মিথ্যে হয়ে গেছে মা। তাই কি ঠিক করেছি জান, কলকাতায় গিয়ে একবার তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে—

এ কি করল প্রমিতা! নিজের ডান হাতটা কিনা চাপা দিল সুধাময়ীর মুখে।

হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলেন সুধাময়ী--বিতাড়িত পুত্রবধূ যদি—অকম্পিত গলায় বললেন সুধাময়ী।

শাশুড়িকে ভোলাবার চেষ্টা করে—শাশুড়ির কাছে তাই বড় অভিশাপ।

তোমার নিজের কথা—যা তুমি লেখ নি চিঠিতে, তাই শুনতে চাই—মাথা নিচু করলে ত চলবে না? আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন সুধাময়ী।

এ কী মূর্তি! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খর কণ্ঠস্বর, অন্তর্দাহে দীর্ণ একটি কঙ্কাল যেন। নয়নাভিরাম মন্দির যেন ভেঙ্গে চূরমার হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু পাথর আর বালি।

—আপনি এখন অসুস্থ মা। ভয়ার্ত প্রমিতা আবেদন জানালেন। —ভাল হোন, সব শুনবেন।

—ভালই ত আমি ছিলাম, কিন্তু থাকতে পেলাম কৈ? এক রকম রোগ হয়, যা ভাল করতে গেলে বিষ লাগে। আমার এই মরণ যন্ত্রণার সময় তোমার কাছে তাই চাই—এইবার বল ত বৌমা?

নতশির প্রমিতা বসে রইল নিস্পন্দ ভাবে।

তুমি হয়ত ভাবছো, আরো খাড়া হলেন সুধাময়ী—সব শেষ হবার পর এ' আস্ফালন পাগলামি। তা জানি। কিন্তু এটা ত আজও জানতে পারলাম না—ঠিক সেই সময় আমার কলকাতায় যাবার প্রস্তাবটা তুমিই নাকচ করেছিলে কেন?

—আপনার শুধু কষ্টই হতো মা।

—এখন বুঝি খুব আনন্দ পাচ্ছি ?

—তা নয়, মাথা তুলল প্রমিতা এতক্ষণে—ব্যর্থতার দুঃখে হয়ত আপনি প্রাণে বাঁচতেন না।

—তাহলে শুধু আমাকে বাঁচাতেই—

—আপনার ছেলেকেও। নিজেই চমকে উঠল প্রমিতা। জোরের সঙ্গে শাশুড়ির মুখের উপর কথা কওয়া এই বোধ হয় প্রথম।

ওদিকে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সুধাময়ী। অন্তর্দাহের জ্বালায় ছটফট করছিলেন এ'কদিন—বুঝলেন বাইরে তা প্রকাশ করা অর্থহীন। যার সন্তানের সম্মান রাখার জন্যে পথে বসতে হল একজনকে, নিষ্ফল চিৎকারে কিম্বা ব্যর্থ অভিশাপে সে পথবাস শেষ হবার নয়। পথবাসিনীকে নিজের বুকে তুলে ধরাই হবে সন্তানের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। সুধাময়ী প্রমিতার হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে।

ঘরে এল আনন্দি। প্রায় প্রমিতারই বয়সী। দেহাতী যুবতী। গড়ন লম্বাটে, রঙে উজ্জ্বলতার আভা। সামনে দাঁত কিছু উঁচু—হাসলে দৃষ্টি না পড়ে যায় না।

বলাকওয়া নেই টপ করে প্রমিতার পা ছুঁয়ে খাড়া দাঁড়াল। প্রমিতা তটস্থ। সুধাময়ী না হেসে পারলেন না।

—শোন্, বললেন সুধাময়ী—এ' তোর দিদি, দেখাশোনা করবি—রেঁধে খাওয়াবি—বুঝলি ? জান মা, আমার আনন্দির হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, নিমন্ত্রণ করে তাকে ডেকে পাঠালেও সে এ পাড়া মুখো হয় না। এখন যা, চা করে নিয়ে আয় ! জলদি !

—যাব আর আসব। বলেই মরি কি বাঁচি এই ভাবে ছুট দিল আনন্দি।

—এই এক মেয়ে, ভারি গলায় বললেন সুধাময়ী—আনন্দির জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে। ভাল ঘরেই বিয়ে হয়েছিল। দশ বছর কেটে যাবার পরেও ছেলে হয় না দেখে, স্বামীটা আবার বিয়ে করল। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কাশীতে এনে আনন্দিকে দিলে পাণ্ডাদের

কাছে রেচে। আমার কালো খবর পেয়ে আনন্দিকে তাদের খপ্পর থেকে তুলে এনে দিলে আমার জিম্মায়। সেই থেকেই আছে। কথা শেষে সুধাময়ী দৃষ্টি ফেরালেন বাইরের দিকে। রোদটা চাপা পড়েছে। মেঘ জমতে সুরু হয়েছে! সে দিকে চোখ রেখেই বললেন আবার—বাইরের মেয়ের ওপর টান—বিশ্বনাথের বোধ হয় মনোমত হল না। এবার সাধ মেটালেন আমার ঘরের—

—মা, শশব্যস্ত প্রমিতা বলল—কার জন্যে চা আনতে বললেন?

—আমার মায়ের জন্যে।

—কিন্তু আমি স্নান না করে ত খাই না—এ' অভ্যেস ত আপনিই করিয়েছিলেন।

—আজ কোন নিয়ম, কোন অভ্যেস নয়—এমনি ভাবে আমার কাছটিতে বসে খেতে হবে।

এগিয়ে এলেন তিনি। প্রমিতার অবিন্যস্ত চুলগুলি গুছিয়ে দিয়ে পিঠে হাত রাখলেন। পুত্রবধুর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে সুধাময়ী হয়ত চেয়েছিলেন কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু বিপদ হল প্রমিতার। পশ্চিম দিক থেকে আসা সর্বনাশা জলোচ্ছ্বাসের শব্দ যেদিন তার কানে এসেছিল, তারপর সে প্লাবনে তার মাটি লুপ্ত হওয়া—তার স্বর্গ নিকেতনের বিলুপ্তি—সবই ত সেদিন থেকে এসেছে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে—কিন্তু এই মুহূর্তে কেন এত আন্দোলন হৃদয়-গভীরে! কার যেন বাইরে আসার মাথা কোটাকুটি অতলান্তিক স্তর থেকে। অসহায়া পারল না রোধ করতে এই অসহনীয় আবেগ। আশ্চর্য! এত জল কোথায় ছিল এতদিন? পিতৃ-মাতৃহীনা স্বামী পরিত্যক্তা লুটিয়ে পড়ল রোগাক্রান্তার চরণপ্রান্তে।

—ছোটমা।

নিচের তলা থেকে এ' সময় শোনা গেল এক পুরুষের উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

—ওঠ মা? বললেন সুধাময়ী—আমার কালো আসছে। ক্ষিপ্র হাতে চোখ মুছে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল প্রমিতা।

মাথা নত করে নাতিদীর্ঘ দরজা দিয়ে যিনি প্রবেশ করলেন—প্রমিতার দৃষ্টি নিমেষে নিবদ্ধ হয়ে গেল তাঁর প্রতি অস্বাভাবিক ভাবে।

আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাধারণ বাঙালীর দৈর্ঘ্যের তুলনায় ব্যতিক্রম। রংয়ের গোলাপী আভা—যত্নের অভাবে কিছুটা ম্লান, ঘাড় অবধি নেমে আসা রুক্ষ অবিন্যস্ত কাঁচা-পাকা চুল। মোটা জিনের ট্রাউজার, গলাবন্ধ কোট—বহু ব্যবহারে মলিনতা প্রকটতর। মুখে পান। ঠোঁট দুটি অত্যুজ্জ্বল লাল। চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। বিরাট গোঁফ জোড়া—বাঙলা দেশের এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে স্মরণে আনে। পায়ে সাদা কেম্বিসের জুতা। গলায় বুক দেখার যন্ত্র—হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

—এস, কালো এস! সস্নেহে আহ্বান করলেন সুধাময়ী। প্রমিতার এই হতভম্ব ভাবটা দেখেই অনুমানের হাসিতে ঘরটা ভরিয়ে তুললেন ডাক্তার।

—বেচারীকে কি বিপদেই না ফেলেছ ছোটমা! গায়ের রংটা দেখছে সাদাটে অথচ নাম কিনা কালো।

—এমনি করেই বুঝি নিজের বিজ্ঞাপন দিতে হয়? সুধাময়ীও হাসতে লাগলেন।

—দেওয়া আর হচ্ছে কই? খাটে আরাম করে বসে ডাক্তার বললেন—তোমার রক্ষা কবচের কাছে আমার সব চেষ্টাই মাটি।

—দেখেছ! সুধাময়ী ব্যস্ত হলেন—এখনও তোমাদের পরিচয়টা করানো হয়নি!

—বাহুল্য, ছোটমা! গলা থেকে যন্ত্রটা নিয়ে বললেন ডাক্তার—ফুলের পরিচয় গন্ধে—ঘরে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি। সেদিন তোমার 'কাশীত্ব পাবার' অবস্থা দেখে চিঠিটা লেখবার সময় মনে আমার যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি ছোটমা, হাতটাও কেঁপেছিল—কি জানি কি প্রতিক্রিয়া হবে? কিন্তু তখন কি জানতাম সঙ্কোচটা অর্থহীন। তোমার সৃষ্টি—তোমার অসুখে না এসে পারে!—এখন দেখি বুকটা?

—কালোকে প্রণাম কর বৌমা? বালিশে মাথা রেখে বললেন সুধাময়ী।

লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল প্রমিতা। হাত তুলে একটা নমস্কার—চলতি প্রাথমিক ভদ্রতা, সেটা পর্যন্ত করা হয়নি এখনও। ডাক্তারের পায়ে হাতটা ঠেকিয়ে প্রণামটা সারল প্রমিতা কোন রকমে।

ডাক্তারী পরীক্ষা শেষ হতেই সুধাময়ী বললেন প্রমিতাকে—আর তোমায় কাশীর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতে হবে না। ঘরে বসেই পেয়ে গেলে এক সঙ্গে।

কী পাওয়া গেল—জিজ্ঞাসু চোখে প্রমিতা চাইতে সুধাময়ী বললেন আবার—সারা কাশীর ধুলো। কালোর চরণ নিত্য বরুণা থেকে অসি পর্যন্ত চষে বেড়ায়।

—তবু ভিক্ষে জোটে না, বললেন ডাক্তার—কাশীর যত নুড়ি আছে আর কিছু না পাক গঙ্গাজলটা পায়। আমার সবই শুকনো।

—মার প্রত্যেক চিঠিতে, এতক্ষণে প্রমিতা যেন ধাতস্থ হয়েছে। বলল—আপনার কথা পড়তে পড়তে কেবলই মনে হত—কবে আপনার দেখা পাব!

—আমার সম্বন্ধে ছোটমার চিঠি? হেসে উঠলেন ডাক্তার, বললেন—তিলের বৃদ্ধি বোধ হয় তালকেও ছাপিয়ে গেছে! তা এখন অমিলটা চোখে পড়ছে ত?

—কীসের অমিল? পাল্টা প্রশ্ন করে বসল প্রমিতা।

—আখরের সঙ্গে প্রত্যক্ষের।

—পড়ছে বৈকি! সুধা-স্নিগ্ধ গলায় বলল প্রমিতা—তবে সেটা অমিলের নয়, অসম্পূর্ণের। দেখা পেলাম—আজকের দিনটা আমার—

প্রমিতাকে শেষ করতে না দিয়েই ডাক্তার বললেন—কিন্তু এই ভাবে দেখা হওয়া? এতবড় ক্ষতির মধ্যে?

—লোকসানই বা কী? পরিচয় ত হল। একটু থেমে প্রমিতা বক্তব্য শেষ করল—ক্ষতির অন্য দিকটাই ত পূরণ। প্রমিতার কথা, যেন স্থানকালপাত্রের কোন ইঙ্গিতই নেই। এ যেন বারবার ফিরে

আসা অন্তহীন কালের বাণী। হাতের কাজ রেখে দীর্ঘদেহী ডাক্তার চেয়ে রইলেন।

প্রমিতা প্রসঙ্গটা নিমেষে পাল্টে প্রশ্ন করল—রক্ষা কবজের কথা তখন যে বললেন—বুঝলাম না ত?

—জিজ্ঞেস কর তোমার মাকে।

উত্তর দিলেন সুধাময়ী—কাশীর সবাই ডাকে গোরা ডাক্তার বলে। তারা ঠিক নামেই ডাকে। আমি কিন্তু বলি কালো ডাক্তার।

—কারণটা যে বাদ পড়ল? ডাক্তার যেন সুধাময়ীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন।

—কারণ আবার কী? মা ছেলেকে ডাকবে, তার আবার কারণ থাকে নাকি?

—হয়ত থাকে না। সহাস্যে বললেন ডাক্তার—কিন্তু এ ক্ষেত্রে আছে। তাহলে বলি শোন, এ চামড়ার রংটা নাকি লোকের নজরে পড়বার মতন। ছোটমার ভয় তাঁর এই খোকাটির নজর লাগতে পারে। 'কালো' নামের রক্ষাকবচ বেঁধে দিলে নাকি সে ভয় আর থাকে না।

ডাক্তারের সঙ্গে প্রমিতাও একচোট হেসে উঠল। কাপ দুই চা নিয়ে আনন্দি এল এতক্ষণে।

—এই তোর যাবে আর আসবে! ধমকে উঠলেন সুধাময়ী।

—কেয়া করেগা! মুখে মুখে ফিরিস্তি দিল আনন্দি—কাঠ ভিজা, চুল্লি ভিজা—বহুত পরিশানি—

—ঠিক হ্যায়। সস্নেহে আনন্দির পিঠ চাপড়ে বললেন ডাক্তার—তুমি যে গরম পাঁচনটা নিত্য দিচ্ছ—বিশ্বনাথের ভাগ্যি। আমার চুলের পরমায়ু হোক তোমার!

আদন্ত বিকশিত হাসি হাসল আনন্দি।

থাকতে না পেরে সুধাময়ী বললেন—দূর মুখপুড়ি!

মুখপুড়ি! ও ত গালি! দুমদুম করে পা ফেলে আনন্দি বেরিয়ে গেল।

ধীরেসুস্থে চা শেষ করে, পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে গোটাকতক পান মুখে পুরে উঠে পড়লেন ডাক্তার।

এগিয়ে এসে প্রমিতা বলল—মাকে কোন ওষুধ দেবেন না? যেন কতবড় কথাটাই না স্মরণ করিয়ে দিলে।

—ওষুধ? মুখে-পোরা পানটা ভাল ভাবে আয়ত্তে এনে বললেন তিনি—আজ সকালেই কলকাতা থেকে যে ওষুধ এসে গেছে—আমার ড্রাগ তার কাছে কিছু না। আচ্ছা, এখন চলি, ছোটমা! প্রমিতাও এলো ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মুখে।

—মার সম্প্রতি অসুখটা কী?

ডাক্তারকে দাঁড়াতে হল। বললেন—ইউরিনে সুগার থাকায় হার্টের অবস্থা কোন কালেই ভাল নয়। তার ওপর কি যে ঝঞ্ঝাট তোমরা বাঁধালে—রক্তের চাপ এখন সাংঘাতিক নিচের দিকে।

—তাহলে? রৌদ্রবিকশিত দিনটা প্রমিতার চোখে ঝাপসা ঠেকল।

—তাহলে! আঙুলে ধরা চুনটা জিভে লাগিয়ে ডাক্তার বললেন—তাহলে সহজ কথায় কাশীত্ব প্রাপ্তি। তবে যতদিন তা না হচ্ছে চিকিৎসাটা দরকার। তবে সেটা ব্যাধির চেয়ে মনের! সেইজন্যেই ত ত্রি-সংসারে তোমারই ডাক পড়ল।

—কিন্তু আমি কী পারব? প্রমিতা যেন আঁতকে উঠল।

দু-পা নেমে আবার ফিরলেন ডাক্তার। বললেন—ব্যথাতুরাই হয় ব্যথাতুরার আরোগ্য-ওষুধ। তুমি পারবে না? তবে কি পারবে ও পাড়ার মাসি পিসি! এখন চলি! ডাক্তার যেন নিভে আসা প্রদীপে কিছুটা তেল ঢেলে সে দিনের মতন বিদায় নিলেন।

প্রমিতার হাতদুটি যে সে-দিন থেকে নিযুক্ত হল সুধাময়ীর পরিচর্যায় তাই নয়, নিজেকে অর্পণ করল সংসারের দায়-দায়িত্বের মধ্যে। ডাক্তার বলেছেন—চিকিৎসা ব্যাধির নয়, মনের। রোগিনীকে সর্বোতভাবে চিন্তামুক্ত করাই ত তাহলে চিকিৎসা। নিজেকে সুধাময়ীর সংসারে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এই কথা সর্বজন

সমর্থিত হল যে, এযাবত সুধাময়ীকে ঘিরে যারা একাত্ম হয়ে আছেন, তাঁদের কারুরই অধিকার বা সম্পর্ক এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলনা এই নতুনের আসার দরুন। বরঞ্চ বিদেশে থাকা আত্মীয়ের ঘরে আসার আনন্দটা যেন পেয়েছে সবাই। বলা বাহুল্য আনন্দি হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে যেন।

সেদিন সুধাময়ীকে যথারীতি পরীক্ষা করে এবং ডাক্তারি উপদেশ দিয়ে ডাক্তার এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়—বৃষ্টি এল সপ-সপিয়ে।

ঘরে সাজা পান ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে প্রমিতা সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল—আমাদের সম্পর্কটা?

—বাঙ্গালী মেয়েরা ত সম্পর্ক পাতাতে স্পেশ্যালিস্ট? সহাস্যে বললেন ডাক্তার—যা হোক একটা পাতিয়ে ফেল।

—মার চিঠিতে জেনেছি, গোটা কাশীটাই ত আপনার আত্মীয়।

—তা বলতে পার। সে-দিক থেকে কাশীর বুড়শিবকে হারিয়ে দিয়েছি। তাঁর ভক্তের সংখ্যার চেয়ে আমার আত্মীয়ের সংখ্যা বেশী।

—সেই জন্যই বুঝি ঘরের আত্মীয় হল না? রহস্যোচ্ছলে কথাটা বলেই প্রমিতা যেন মনে মনে জিভ কাটল। অত্যল্প দিনের পরিচয়ে ঐ মন্তব্য শুধু মাত্রাধিক্য নয়, অশোভনও বটে।

কিন্তু যাঁর উদ্দেশ্যে ঐ মন্তব্য—তিনি নির্বিকার। পানের পিকটা ফেলে ডাক্তার বললেন—হল না নয়, জুটলো না।

এই সহজ সরল স্বীকারোক্তিটা প্রমিতাকে যেন ধরাশায়ী করে দিল। প্রত্যুত্তরে ডাক্তার যা জবাব দিলেন তা যেন কোন অতীতে মন দেওয়া-নেওয়া খেলার বিড়ম্বিত পরিণতির স্বীকারোক্তি বলে মনে হল প্রমিতার।

ডাক্তার প্রমিতার এই হতশ্রী ভাবটায় কোন আমলই দিলেন না, বললেন—হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্ক! সম্বোধনেই একরকম হয়ে গেছে।

কথাটা বোধগম্য না হওয়ায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রমিতা চাইতে তিনি বললেন আবার—মাথায় গেল না বুঝি ?—বন্ধু।

গোরা ডাক্তারের বন্ধুত্ব! অখণ্ড প্রতাপ যাঁর কাশীর বাঙালী টোলায়, ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক উজ্জ্বলতার কাছে আপামর নতশির—তাঁর বন্ধুত্ব? হতবাক প্রমিতার তরফ থেকে এ দুর্মূল্য জিনিষ নেবার আগ্রহ অথবা প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত—উভয়েই রইল অপ্রকাশ।

এদিকে ডাক্তার প্রমিতার এই মৌনতা তাঁর অন্তরের সমর্থন বলেই গ্রহণ করলেন। বললেন—কাশী জুড়ে হয়ে আছি দাদা, দা'ঠাকুর, ডাক্তার সাব, কাকাবাবু, গোরা, কালো, দেবতা এমন কি বাবা পর্যন্ত—যেন গলায় পাক দেওয়া একটা দড়ির দুমুখ ধরে টানাটানি চলছে—একটা বাৎসল্যের আর একটা ভক্তির। নিত্যপানে অমৃতেও অরুচি ধরে। এবার চাই ঝাল-টক-নুন মাখানো—এমন কিছু, খেয়ে বুঝতে পারি আমি একটা মানুষ। যে মানুষটা ওই দুটো নেশা ধরানো সম্পর্কের বাইরে। বৃষ্টিটা থেমেছে, চলি আজ।

ডাক্তার ত প্রমিতার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভবিষ্যত সম্পর্ক পাতিয়ে বসলেন। কিন্তু নিথর নিস্পন্দ রইল প্রশ্নকর্ত্রী নিজে। কিছুটা সময় যাবার পরেও কিছু বাচিক সমর্থন যখন এলো না প্রমিতার তরফ থেকে—ভাবোচ্ছ্বাসী ডাক্তার আত্মস্থ হলেন যেন। অল্প পরিচয়ে একটা হৃদ্যতা প্রকাশ অনুচিত, তারই কি ইঙ্গিত এই কঠিন নীরবতা কিন্তু সমস্যা ত ছিল এই মৌনমুখীর—তিনি শুধু সমাধানের কথা বলেছেন মাত্র। তবে? বারান্দায় রাখা ক্যাম্বিসের ব্যাগটা এবার তুলে নিলেন ডাক্তার।

—একটা কথা—

ডাক্তারকে আবার দাঁড়াতে হল। বললেন—যথা?

—ঘর্ষণে যদি কোনদিন তিক্ততা দেখা দেয়? আচ্ছন্ন ভাবটা সামলে মুখোমুখী প্রশ্ন করল প্রমিতা।

স-উল্লাসে বললেন ডাক্তার—সে সম্ভাবনা ত রইলই।

—তারপর ?

—তারপর ! স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত গলায় বললেন ডাক্তার, —যে আঘাতে রেণী পার্কের স্বর্গরাজ্যটা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল—তারই প্রতিক্রিয়ায় এই বাড়িতে ওই বুড়িটা যখন থরথরিয়ে কাঁপছিল, তখন আমিই ত ছিলাম তাঁর পাশে। বুঝতেই পাচ্ছো তা হলে, তোমার সম্বন্ধে আমারও অজানা কিছু নেই। সেই ভাঙ্গা প্রাসাদের তলায় তলিয়ে না গিয়ে সহজ ভাবে যে দাঁড়ায়, এমন কি ভাত কাপড়ের ন্যায্য পাওনা পর্যন্ত ছেড়ে আসে—ঐ তারপরের উত্তর কী তাকে দিতে হবে ? বিষ্টিটা ধরেছে—চলি এখন !

ডাক্তার নেমে গেলেন। একটা অপার্থিব শিহরণ যেন প্রমিতার রক্তের মধ্যে সাড়া তুলল। এক রকম ভুলেই গেল পাশের ঘরে রয়েছে তারই পরে নির্ভরশীলা কঠিন রোগগ্রস্তা এক বৃদ্ধা। ঐ বিস্মৃতির কারণ ডাক্তারের বন্ধুত্বলাভ হেতু নয়। স্বামীচ্যুত হবার কারণ জানবার যে দুর্দমনীয় কৌতূহল—যা হতে রেহাই পায়নি প্রমিতার ভাইয়েরা পর্যন্ত, সেই স্বাভাবিক রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না এই দীর্ঘদেহীর মধ্যে। অথচ যাঁর আছে তার সম্বন্ধে সব জানাই হয়ে গেছে—তিনি নিজে যে আজও ঐ বিচ্ছেদ-কারণ অনুসন্ধান করে চলেছেন অন্ধের মতন। অসম্পূর্ণ জানা ত রোগাক্রান্ত হওয়া। ঐ ব্যাধিমুক্তি সম্ভব সম্পূর্ণ জানার পর। বুঝল প্রমিতা, এ চিকিৎসক নৈব্যক্তিক মনটি নিয়ে শুধু রোগীর সেবা করেন না—ওই মনটি নিয়েই সংসারের অলিগলিতে হেঁটে চলেন। যুক্তকরে প্রমিতা কাকে যেন প্রণাম করল—আঃ, এমন লোকও আছে তাহলে !

প্রমিতার এই কিছুদিন আগেও শুধু একটাই পরিচয় ছিল—মিসেস্ সরকার নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে। সম্প্রতিকালে সে পরিচয়ের যেমন ব্যাপকতা হয়েছে, তেমনি পরিধির সীমাও সুদূর প্রসারিত। প্রমিতা এখন কোথাও দিদি, কোথাও দিদিমণি, কোথাও প্রমি, কোথাও প্রমি মা। কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর কেউ কাশীতে এলে

আশ্চর্য হবেন বৈকি! যে মেয়েকে দেখা যেত নিউ মার্কেটে, চৌরঙ্গীর সিনেমা হলে, কৌলীন্য-গৌরব হোটেলে, আর্ট প্রদর্শনীতে ক্রীড়া ময়দানে এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অত্যাধুনিক বেশে—সেই মেয়েকে যদি দেখতে হয়—আবরণে সাদা সস্তা শাড়ি, সেমিজ আর উড়নি, আভরণে দুহাতে দুটি বালা, কাশীর অসূর্যম্পর্শ গলিতে, গোড়েন ঘাটে কুকুরদের মধ্যে, উদ্বাস্তু মহিলা সমাজে, ন্যায়রত্নের টোলে, রামায়ণ পাঠরত কোন দেবস্থানে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে—দৃষ্টিতে তার ঘোর লাগাই স্বাভাবিক।

সম্প্রতিকালে রূপান্তরিত এই যে প্রমিতা—এই রূপই তার সব নয়। দৃষ্টির বাইরে যে প্রমিতা—সে এক অনন্যচি সাধিকা। ঐ সাধনা তার অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের নয়—কাশীর বাঙ্গালীটোলার প্রতিটি পাথরের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার সাধনা।

অসুস্থ শাশুড়ির প্রতিভূ হয়ে তাঁর দৈনন্দিন কাজগুলো যেদিন প্রমিতা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল—সারা দিনটা তার কেটেছিল নিগূঢ় বিস্ময়ে। পুত্রের কাছ থেকে যে টাকাটা আসে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে সংসার খরচা বাবদ—সংখ্যায় বেশ ভারী—প্রমিতার এইটুকু জানা ছিল, কারণ এই ত সেদিনও সে-ই পাঠিয়েছিল কলকাতা থেকে নিখিলেশের নামে কিন্তু জানা ছিল না, সেই টাকার বেশীটাই চলে যায় বাঙ্গালীটোলার অনেক বাড়িতে গোপন পথে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবার ক্ষেত্রে কিছু দান অভাবীদের মধ্যে—সেটা টাকারই সদ্ব্যবহার। কিন্তু প্রথম যেদিন সুধাময়ীর হয়ে তাঁর নির্দেশমত অভাবীদের হাতে টাকাটা দিয়েছিল বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে—তাদের শুষ্ক আননে যে আনন্দদীপ্তি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল, দান-গ্রহীতার পক্ষে এ আনন্দ প্রকাশ কখনই সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞতা-জনিত দীনতার প্রকাশই স্বাভাবিক। এই চলতি নিয়মটাই প্রমিতার জানা ছিল—কিন্তু জানা ছিল না—দাতা যেখানে গ্রহীতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে একাসনে বসে—সেখানে মার কাছ থেকে পাওয়ার আনন্দে সন্তানসন্ততি এমনি সুদীপ্ত হয়েই ওঠে। সেদিন থেকেই

প্রমিতার নিরলস সাধনা—কাশীর বাঙ্গালীটোলার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

চাকরির দরখাস্তের কোন উত্তর এল কিনা লেটারবক্সটা দেখে উপরে এল প্রমিতা। না, আজও কোন উত্তর এল না। ভাবনার কথা। যে ক-টা টাকা অন্তুর কাছ থেকে ধার নিয়ে কাশীতে এসেছিল—শেষ হয়ে এল বলে। বাড়তি কিছু খরচ এখন ত প্রমিতার কাছে বিলাস। সব খরচ না হয় বন্ধ হল কিন্তু খাই-খরচ!

ভরসা ছিল কবীদ ডিগ্রিটা যখন আছে, আর আছে ইংলিশে অনার্স—তখন মোটামুটি একটা শিক্ষয়িত্রীর চাকরি যে কোন স্কুল থেকে পেয়ে যাবে। কিন্তু দেখতে দেখতে দুটো মাস ত কাটতে চল্লো! না, নিজে থেকে গিয়ে তদ্বির না করলে হবে না। শাড়িটা বদলে বেরুচ্ছে প্রমিতা, ডেকে পাঠালেন সুধাময়ী।

—ডাকছেন, মা?

—বেরুচ্ছো বুঝি?

—যাচ্ছি, একটা স্কুলে, দেখি যদি—

—তা বেশ। ফিরে এস, তখন কথা হবে।

—বিশেষ জরুরি কিছু?

সময় নিলেন সুধাময়ী। বললেন—তোমায় বলা হয়নি, এ মাসে নিখিলেশের পাঠান টাকাটা ফেরত পাঠিয়েছি আর লিখেও দিয়েছি ভবিষ্যতে যেন আর না পাঠায়।

"টাকা ফেরত পাঠিয়েছি!"

কথাটা শোনামাত্র যেন কাঁপল। তাহলে বাঙ্গালীটোলার সেই সব অভাবী লোকেরা যাবে কোথায়? এ সিদ্ধান্ত কেবল যে অসঙ্গত তাই নয় অবান্তর। তবু প্রমিতাকে চুপ করে থাকতে হল কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পারিবারিক—মা ছেলের।

—টাকা আপনার, আমি আর কি বলব বলুন!

উঠে বসে বললেন তিনি—তোমায় বলার কারণ, তুমি একটা

খুব ছোট দেখে বাড়ি দেখ! কালোকে, আনন্দিকেও বলেছি দেখতে।

এবার প্রমিতার খটকা লাগল :—কেন মা? এ বাড়ি কি দোষ করলে?

—দোষের কথা নয়, মা! ম্লান হাসিটি হেসে বললেন সুধাময়ী —এ বাড়ির ভাড়া অনেক। তোমার শ্বশুরের ইনস্যুর‍্যান্স বাবদ যে টাকাটা এখনও আছে—এভাবে খরচ করলে বেশীদিন চলবে না। এখন থেকে খরচ কমাতে চাই বৌমা!

প্রমিতার তাড়া ছিল। বিশদ আলোচনার সময় নেই। আর থাকলেই বা কি! ছেলের টাকা মা নেবে কি ফেলে দেবে, তার মাথাব্যথা কেন! কিন্তু খরচের কথা যখন উঠেছে—তাড়া থাকা সত্ত্বেও প্রমিতা দাঁড়িয়ে গেল। সম্প্রতি বাড়তি খরচের কারণ কি তবে সে? কিন্তু অন্তুর কাছ থেকে যে টাকাটা এনেছিল, এ যাবত ত সুধাময়ীর সংসারে ঢেলে আসছে পাকে-প্রকারে। তবে? তবে কী তার ভার চিরস্থায়ী বইবার আশঙ্কায় বিধবার এই উৎকণ্ঠা? কিন্তু অসুস্থ হলেও ত দেখতে পাচ্ছেন —কোথাও না চেষ্টা করছে সে, ভদ্রসম্মত রোজগারের জন্যে। কোথাও যদি কিছু না জোটে কাশীর গঙ্গা ত এখন শুকিয়ে যায়নি, তবু মরণাপন্ন বিধবার গচ্ছিত ধন তার ভাতকাপড়ের জন্যে খরচ হতে দেবে না।

—তাই দেখব মা, অনুচ্চ গলায় বলল প্রমিতা,— এখন তবে আসি?

—এস মা।

বৃষ্টি চলছে সেই সকাল থেকে কিন্তু তার জোরটা বুঝতে পারেনি প্রমিতা সংসারের কাজে। রাস্তায় আসতেই থ হয়ে গেল। কেদারঘাট ত ভাসছে জলে। লোক বলতেও ত নেই কেউ। তাহলে? কিন্তু দাঁড়ালে ত চলবে না। চারটে বাজে—স্কুল বন্ধ হয়ে এলো। শাড়িটা গোছগাছ করে ছাতাটা খুলে হাঁটুভোর জলে নেমে এল প্রমিতা।

একজনের শূন্য জায়গায় আর একজনের আসায় আশেপাশে কিছু পরিবর্তন ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বেণী পার্কের বাড়িতে তেমন পরিবর্তন ত চোখে পড়ে না। বাড়ির আভ্যন্তরিক নিয়ম-কানুন ত চলে আসছে যেমন চলছিল এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। শাশুড়ির অনুপস্থিতিতে যে ঘরের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল প্রমিতা, শুধু সেই ঠাকুরঘরের কাজে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছে বাড়তি লোক—বেতনভুক পূজারী। দু'বেলা ধূপের গন্ধের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হয় যথা সময়ে। মোট কথা, প্রমিতার স্নেহচ্ছায়ায় এ বাড়িতে যারা কালাতিপাত করত নির্ভাবনায়—বর্তমানে তারা যে স্থানচ্যুত হয়নি—এ কথা অতি বড় নিন্দুককেও স্বীকার করতে হবে।

তাহলে অফিসে সরকার সাহেব সম্বন্ধে সম্প্রতিকালে এ কানাকানি কেন? কেন এত চাপা ফিসফিসানি কেরাণী-টেবিলে? সপ্তাহখানেক হল অন্তর কানে যে কিছু আসছে না—এমন নয়। তবে কিনা কোম্পানীর দেওয়া মাহিনার পরিবর্তে কোম্পানীকে কতখানি কী দিতে পারল তারই সাধনায় এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে—সময় কোথায় পরের কথায় কান দেবার! কিন্তু দিতে হল আজ!

বহুদিনের লোক দত্তমশায় সরকার সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন—না, মান-ইজ্জত নিয়ে আর এখানে কাজ করা চলছে না। যা নয় তাই বলছেন।

—যা বলেছেন দাদা। ওধার থেকে কে যেন ফুঁসে উঠল—এই দু'চার দিন হল যাকে বলে—

—আরে এমন যে হবে তা আমি জানতাম। বাবা বিবেকের দংশন—

তবলার অভাবে টেবিলে তাল দিয়ে আর একজন সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল—বড় যদি হতে চাও—বৌকে তালাক দাও—হেঁ-হেঁ।

চাপরাশি এল এমন সময় সরকার সাহেবের চেম্বার থেকে ফাইল নিয়ে অন্তুর কাছে। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে উঠল।

ফাইলের ব্যাপার নিতান্ত মামুলি। যে জারম্যান ফোরম্যান ওয়ার্কশপে টেকনিক্যাল কাজে রয়েছে—আগামী মাসে তার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্কসে তাই অন্তু লিখেছিল যে, ভিসার মেয়াদ বাড়াবার প্রয়োজন আছে কিনা। সেখানকার জি. এম ত ডিসিশন নিতে পারত! অন্তু ভেবেই পেল না ফাইলটা সরকার সাহেবের কাছে গেলই বা কেন? আর কেনই বা তিনি এক কোণে লিখলেন "প্লিজ স্পিক্"?

ফাইল নিয়ে অন্তুকে উঠে দাঁড়াতেই হল। পিছন থেকে টিপ্পনি এল—বেশী কাজ দেখানোর ফল। এবার ঠেলা সামলাও।

—না হে না, এ দত্তমশাই নন—যতই হোক ভূতপূর্বক শ্যালক। হাসিতে টিপ্পনিতে কেরাণী মহলটা গমগমিয়ে উঠল।

ঘরে সাহেব একা। কিছু করছিলেন বলে বোধ হল না অন্তুর। কার যেন অপেক্ষায় আছেন।

—বসুন!

এটা অভাবনীয়। তবু বসতে হল অন্তুকে। দু এক কথায় ফাইলের কাজ শেষ হয়ে গেল। অন্তুর উঠবার মুখে নিখিলেশ যে প্রশ্ন করল সেটা আরো অভাবনীয়।

—কেমন আছেন তিনি?

অন্তু বুঝল কার সম্বন্ধে এ' জিজ্ঞাসাবাদ।

—যতদূর জানি, ভালই আছেন।

যতদূর জানি! ঝুঁকে পড়ল নিখিলেশ—মানে?

—মানে চিঠিতে জানাত!

চিঠিতে? টেবিলে জড়ান কাগজগুলো একদিকে সরিয়ে নিখিলেশ বলল—আপনাদের বাড়িতে তিনি নেই নাকি?

—না।

এবার অন্তুর মতই সাহেব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিপদ হল অন্তুর। যাবে কি থাকবে! এমন অস্বস্তির মধ্যেও লোকে পড়ে!

—কোথায় আছেন তিনি? নিখিলেশের কণ্ঠস্বরটা বেশ অস্বাভাবিক লাগল অন্তুর।

—কাশীতে।

জলে তলিয়ে যাওয়া মানুষ যেন শক্ত কিছু ধরেছে এতক্ষণে।

—কতদিন গেছেন?

—তা মাস দুয়েক হতে চললো।

—মাস দুয়েক! কি যেন হিসেব করল নিখিলেশ—কোথায় আছেন জানেন?

—আপনার মার কাছে। তাঁর অসুখের খবর পেয়েই চলে গেছে—তিনি যে খুব অসুস্থ।

প্রশ্নের অতিরিক্ত যদি কিছু বলে থাকে অন্তু, বলেছে চিত্ত-পীড়নের জ্বালায়।

নিখিলেশ আর কোন প্রশ্ন করল না। মাথা নিচু করে কিছুকাল থেকে বেল টিপল এক সময়। চাপরাশি আসতে ভিজিটার প্রবেশ নিষেধের আদেশ দিল। সেলাম জানিয়ে চাপরাশি যেতেই ফোনে পি-এ-কে আদেশ দিল—"নট টু পাস্ এনি কল টু মী টিল ফারদার ইন্টিমেশন"।

মিনিট দশেক বাদ নিখিলেশের ঘর থেকে এসেই অন্তু দরখাস্ত পেশ করল দিন চারেকের ছুটির।

ভাদ্রের শেষ। পচা গরমে কাশীর নাভিশ্বাস উঠেছে। হাওয়া বলতে নেই এতটুকু। কেদারের পুজো সেরে এইমাত্র রাস্তায় এসে দাঁড়াল প্রমিতা। দিনটা গেছে নিরম্বু উপবাসে, তার ওপর মাথায়

ভিজে চুলের ডাঁই, এক হাতে গঙ্গাস্নানের ভিজে শাড়ি, অন্য হাতে সাজি—কিছু প্রসাদ, কিছু নির্মাল্য ভরা। হাঁটছে প্রমিতা কিন্তু যেন নিজের পায়ে নয়। কোথাও একটু বসতে পারলে বাঁচে এখন। ভেতরটা তেষ্টায় টা-টা করছে। রাত কটা এখন কে জানে।

প্রতি সোমবার 'কেদার-বার' করে আসছিলেন সুধাময়ী আট বছর একাদিক্রমে। অসুস্থ বলে তাঁর এতদিনের ব্রত ত আর বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। তাঁর হয়েই প্রমিতা এখন করে আসছে। প্রমিতা ব্রত সেরে বাড়িতে এলে তাকে পাশে বসিয়ে সুধাময়ী নিজের হাতে আগে কিছু খাইয়ে দেন—তারপর চা-টা যা হোক।

আনন্দি হাসে, কিন্তু প্রমিতা নিরুপায়।

গোড়েনঘাটের কাছে আসতেই কুকুরগুলো যেন প্রমিতার পায়ে লেপটে গেল। প্রস্তুত হয়েই ছিল। মিষ্টিগুলো ধরে দিল প্রমিতা হেঁট হয়ে। এবার বাজার পেরুলেই বাঁ-হাতি গলি। কিন্তু গলির ভেতর অমন করে পালালো কে? কে—ত কে! কিন্তু পেছনটা অনেকটা অন্তুর মতন।

বাঁক ফিরতেই অন্ধকার গলির মুখে একেবারে যার সামনাসামনি হল—প্রমিতা শুধু দিশেহারাই হল না, যেন তার হৃদপিণ্ডের গতি থেমে গেল।

—তোমার কাছেই এসেছি। হাত দুটো যুক্ত করে বলল—অন্ধকারে অপেক্ষমান নিখিলেশ।

—আমার কাছে? প্রমিতা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল এক সময়।

—হ্যাঁ, শুধু তোমার কাছে।

—কিন্তু কেন বলত?

—কারণ তোমার অজানা নয়। আরো ঘনিষ্ট হল নিখিলেশ।

আশে পাশে চোখ ফেরাল প্রমিতা। যদিও কোথাও কেউ নেই এই রাতে, তবু এটা সদর রাস্তা। কি ভেবে বলল প্রমিতা—এস।

যে-রাস্তা দিয়ে এইমাত্র এল, সেই পথে ফিরল আবার। কেদার মন্দিরের বাইরে জুতো খুলে নিঃশব্দে অনুসরণ করল নিখিলেশ প্রমিতাকে। মন্দির অভ্যন্তরে ঘাটের দরজার পাশে বাঁধানো চত্বরে দু'জনে বসল পাশাপাশি। বুড়ো পুরোহিত ওদিকটায় ঝিমুচ্ছে ভাঙের নেশায়। কাছে-পিঠে নেই কেউ।

এ যেন বহুদিন অদর্শনের পর দুই বন্ধু একত্র হল। যে-তীব্র উৎকণ্ঠায় নিখিলেশ প্রমিতাকে পাকরাও করেছিল রাস্তায়, এ অনুকূল পরিবেশে তা মিলিয়ে গেল। প্রমিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যেন এখন নিখিলেশের পক্ষে বাকস্ফুরণের অনতিক্রম বাধা। তার সমস্যাপীড়িত চিত্ত রইল নিশ্চুপ।

প্রমিতাই বলল এক সময়—ছোটদা বুঝি নিয়ে এল?

—নিজের গরজে এসেছি। এতক্ষণে কথা বলতে পারল নিখিলেশ—ও শুধু সঙ্গী।

—তা ও পালালো কেন? বকুনি খাবার ভয়ে নাকি?

—ঠিক তাই। ওটা যদি হয় ত আমার ওপরেই হোক।

—ছিঃ ছিঃ! লাজ-রক্তিম প্রমিতা বলল—আমার বুঝি বকুনি দেওয়াই কাজ?

— ঠিক তার উলটো। প্রমিতার দিকে চেয়ে বলল নিখিলেশ—তুমি যা দাও, অপরে তাই দিতে হাত গুটিয়ে নেয়! তাই ত এলাম তোমারই কাছে।

ভিজে চুলের গ্রন্থি ছড়াতে ছড়াতে প্রমিতা বলল—কিন্তু এ' বিষয়ে আমি কী করতে পারি বল?

স-উৎসাহে নিখিলেশ প্রতিবাদ করল—কিন্তু আমি ত জানি, যে-পারে আমি তারই কাছে এসেছি।

—তুমি ত জান মাকে। একবার যা মন করেন, তার আর পরিবর্তন হয় না।

—কিন্তু আমার পিসতুত ভাই শশিদার কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে! বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন বলে, মা

তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তোমারই অনুরোধে মা তাঁকে আবার আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হেসে উঠল প্রমিতা—সেটা ছিল জীবনমরণের ব্যাপার। আশ্রয় না পেলে না খেতে পেয়ে যে মারা যেতেন সস্ত্রীক। মা তাই শেষ পর্যন্ত—

অত শোনবার ধৈর্য নিখিলেশের কোথায়! প্রায় প্রমিতার হাতটা ধরে ফেলেছিল আর কি!

—এ ক্ষেত্রেও কী তাই নয় প্রমিতা?

নিখিলেশের এমন ব্যথাতুর চাহনি দেখা প্রমিতার পক্ষে কষ্টকর। কষ্টকর এমন দীর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা। নিজের উপসী স্নায়ুতন্ত্রে একটা ব্যথা পেল। তবু অশান্ত নিখিলেশকে যেন বোঝাতে চাইল—মার অসুখটাই হার্টের। তার ওপর প্রেসারটা নিচের দিকে। তোমার টাকা পাঠান নিয়ে যদি তাঁর উত্তেজনা আসে—তাহলে যে শেষ পর্যন্ত—

প্রমিতার কথার ওপরই অধৈর্য নিখিলেশ বলে বসল—সেই শেষটার জন্যে, একবার ভেবে দেখেছ কী, আমাকে শুধু দেখে যেতে হবে পরের মতন?

দু-কূল প্লাবিনী গঙ্গার দিকে দৃষ্টি রেখে আবার বলল নিখিলেশ—তোমায় লেখা শেষ চিঠিতে আমার সম্বন্ধে এই মনোভাব যদি জানাতো মা—তাহলে আজকের এই অবস্থা ঘটতে আমি দিতাম না, প্রমিতা।

উঠে পড়ল নিখিলেশ। নিঃসীম অন্ধকার। কালিবর্ণ নিশীথিনী জড় জগতকে গ্রাস করেছে। অস্তিত্বের মধ্যে শুধু রয়েছে এক পাগলিনীর কল-কল হাসি।

ফিরে এসে বসতেই প্রমিতা যেন সাফাই গাইল—তুমি যেন ভেব না এর মধ্যে আমার কোন হাত আছে?

—একেবারে নেই ভাবতে পাচ্ছি কই?

সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করতেই মনে পড়ল এটা মন্দির। না ধরিয়ে সেটা পকেটে রেখে দিল নিখিলেশ। উপবাস-ক্লিষ্ট প্রমিতা এবার যেন ভেঙ্গে পড়ল। বেদনাতুর স্বরে বলল—

ঠিকই বলেছ। আমি কাশীতে না এলে মা যেমন তোমার টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তেমনিই নিয়ে যেতেন হয়ত।

অনেকদিন পুষে রাখা আক্রোশ প্রকাশের যেন একটা সুযোগ পেল নিখিলেশ—হয়ত তাই। আমাকে দয়া করবার জন্যে তোমার এক কাপড়ে রেণী পার্ক থেকে চলে আসাটাই এ ক্ষেত্রে মাকে প্ররোচিত করেছে আমার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিতে।

কে যেন আচম্বিতে প্রমিতার শ্বাসনালী চেপে ধরেছে। প্রাণপণে নিজেকে সামলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—কিন্তু বিশ্বাস কর, গোরা ডাক্তারই আমায় চিঠি লিখে আনিয়েছেন। বাহাদুরী দেখাব বলে আসিনি। বল ত কাল সকালেই চলে যাই!

—গোরা ডাক্তার চিঠি দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কারণ?

—সে সময় নাকি মার এমন অবস্থা হয়েছিল, আমার আসাটাই নাকি তাঁর সুস্থ হবার উপায় ছিল। এখন একটু ত ভাল, কালই আমি চলে যাব। তাহলে হয়ত—

এতক্ষণ যা করেনি নিখিলেশ, প্রমিতার হাতটা তুলে নিল। বলল—এসময় মার পাশে তুমি আছ এইটুকু আমার সান্ত্বনা প্রমি।

নিখিলেশের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় বলল প্রমিতা—মা ছেলের এই বিরোধের মধ্যে, ঈশ্বর জানেন আমি দায়ী কিনা! কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করেছি বলে ত আমার মনে হয় না।

—হয়ত এটাই কারণ। সুপ্ত নিখিলেশ আবার যেন ক্ষিপ্ত হল।

—কিছু যদি করতে, মা হয়ত রাগের বশে কোন ব্যাপারে আমায় চাপ দিতেন তাঁর প্রাক্তন পুত্রবধূর জন্যে কিছু করতে। কিন্তু যে হাতে চাপ দিতেন কাশীতে এসেই যে সেই হাতটা তুমি ধরে ফেলেছ প্রমিতা। তোমাকে ত আট বছর নাড়াচাড়া করেছি।

আবার উঠে পড়ল নিখিলেশ। এদিক ওদিক ঘুরে প্রমিতার

ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে বলল এক সময়—এখন শুধু ছেলেকে দেখতে হবে কেমন করে তার মা নিঃস্বতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কি জান, অনেক ছেলেই মাকে কিছুই দিতে পারে না—দুর্ভাগ্য তাদের কম নয়—কিন্তু প্রচুর থাকা সত্ত্বেও অভাবী মাকে দেবার পথটা যে ছেলের কাছে বন্ধ হয়ে যায়—তার চাইতে বড় দুর্ভাগ্য আর কী?

প্রমিতা নির্বাক। ওদিকে মন্দিরের দেয়াল-ঘড়িতে ন'টা বাজল। আর কতক্ষণ এভাবে কাটবে। গাঝাড়া-দিয়ে নিখিলেশ তার শেষ সিদ্ধান্ত জানাল—শেষ যখন এইভাবে—তখন নিজের চোখেই শেষটা দেখে যাই। গোরা ডাক্তারের বিধান মানতে পারব না। চল—এবার!

—তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে নাকি? সোজাসুজি চাইল প্রমিতা।

—তোমার কাছে আসার আগে যে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

—কি বললেন তিনি?

—নতুন আর কি? এই তুমি যা বলছ—আমায় দেখে উত্তেজনা আসার সম্ভাবনা—আর তার ফলে কিছু ঘটাও নাকি অসম্ভব নয়।

থেমে থেমে আবার বলল নিখিলেশ—কিছুই যখন অসম্ভব নয় তখন সুনিশ্চিত সম্ভাবনাকে নিজের চোখে দেখে যাই। ওঠ, প্রমিতা!

ভূতল-শায়িনী সর্পিণী যেন ফণা বিস্তার করল এতক্ষণে।

—না।

মুহূর্তে পরিবর্তিত প্রমিতার এ মূর্তি নিখিলেশকে হতচকিত করে তুলল। —মানে?

—মানে তোমার যাওয়া হতেই পারে না। রুগীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

কিন্তু নিখিলেশের কাছে এটা যেন জবরদস্তি। না বলে পারল না সে—তিনি তোমার শুধু শাশুড়ি, তাও এক সময়ের, কিন্তু তিনি আমার মা—সম্পর্কটা ভুলে যেও না প্রমিতা।

খসে পড়া আঁচলটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রমিতা—ভুলে তুমিই যাচ্ছো মার এই অবস্থায় ছেলে হয়ে—

—উপায় কি ? নিখিলেশও মুখোমুখি দাঁড়াল প্রমিতার।

—দিনের পর দিন দারিদ্র্যের মধ্যে থাকার চাইতে আমায় দেখে এই মুহূর্তে যদি মুক্তি পান, তুমিই বল না প্রমিতা, সে মুক্তিটা কী ভাল মুক্তি নয় ? অনেক রাত হল—এবার যাওয়া যাক। কী বল ?

প্রমিতা দাঁড়িয়ে। যেন একটা প্রস্তর মূর্তি। শুধু চোখ দুটো খোলা বাইরের ভয়ঙ্করী অন্ধকারের দিকে। নিখিলেশ চেষ্টা করল কিছু একটা বলে প্রমিতাকে স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সাহস হল না।

—ছেলের দায়িত্ব পালন করা নিয়ে ত কথা! এক সময় নিখিলেশের একান্তে এসে সুধা-স্নিগ্ধ গলায় বলল প্রমিতা।

একটু আগে যে রুদ্রাণী তার পথ আগলে ছিল—এই কি সে ? নিরবচ্ছিন্ন আট বছর যে মূর্তি-মাধুরী দেখে এসেছিল নিখিলেশ—এ ত সেই। সেই শ্রবণ-তৃপ্ত কণ্ঠস্বর। কিছুদিন না শোনার পর যেন আরো মিষ্টি লাগল নিখিলেশের।

—টাকাটা যেমন পাঠাচ্ছিলে তেমনি পাঠিও।

—ভরসা দিচ্ছো ?

—হ্যাঁ গো।

—তোমার নামে ত ?

—দূর।

—তা হলে ?

—মার নামেই।

—কিন্তু! একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল নিখিলেশের গলা দিয়ে।

এমন বলিষ্ঠ লোকটির এমন অসহায় ভাবটা বরাবরই প্রমিতাকে হাসিয়ে এসেছে। হেসে উঠল কলকণ্ঠে। নিখিলেশের চোখে চোখ রেখে বলল—কিন্তু ?—অনেক কিন্তু ত এর আগে অনেকবারই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, এবারও দাওনা কেন!

প্রায়ান্ধকার জনহীন মন্দির অভ্যন্তরে নিশীথরাত্রের স্তব্ধতার মধ্যে উপবাসশীর্ণ প্রমিতার অনাবিল হাসি, নিখিলেশের অন্তরিন্দ্রীয়কে যেন শিথিল করে দিল। চিত্তপীড়নের হাত থেকে রেহাই পাবার সুনিশ্চিত ভরসায় মুক্তি আনন্দের কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না তার মধ্যে। বিস্মৃতি ঘটল মামুলী কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত জানাতে। শুধু চেয়ে রইল এই হ্লাদিনীর দিকে।

—নাও ধর!

—প্রমিতার ডাকে নিখিলেশ যেন ফিরে এল নিজের মধ্যে।

—কী বল ত?

—যাঁর রাজধানীতে এসেছ, তাঁর প্রসাদ।

হাত পেতে প্রসাদ নিয়ে একসঙ্গে সবটাই মুখে পুরে নিখিলেশ বলল—তুমি?

—মাকে দিয়ে তারপর।

—আচ্ছা, আর একটু দাও?

বেচারী ক্ষুধার্ত। রাত ত কম হয়নি। যতখানি পারল প্রমিতা চটপট তুলে দিলে নিখিলেশের প্রসারিত হাতে।

—এবার মুখে দাও? নিখিলেশের হাত প্রায় প্রমিতার মুখের কাছে।

—বললাম না, মাকে দিয়ে—

—কিন্তু! আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল নিখিলেশ—শুনেছি প্রসাদ দিলে ফেরাতে নেই?

—সবই ত জান দেখছি। সত্যি, এখন চলবে না।

নিখিলেশ যেন জেদ ধরল—কেন?

এ আগ্রহান্বিতকে ফেরাবে কী বলে? কোন অজুহাত দেখানো মানেই ত নিখিলেশকে ক্ষুণ্ণ করা। সত্যের আশ্রয়ই ভাল।

—আজ আমার উপবাস। নতনেত্রে অনুচ্চ গলায় বলল প্রমিতা।

—উপবাস? নিখিলেশের সমস্ত আগ্রহ শুধু নিমেষে মিলিয়ে গেল না, নিজেই যেন নিজের কাছে বড় হীন হয়ে গেল।

—আমায় ক্ষমা কর প্রমি!

ছড়ান চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বলল প্রমিতা—কি ছেলেমানুষী হচ্ছে!

—জঘন্য ব্যাপারটা নিয়ে আজই তোমায় কষ্ট দিলাম। যদি জানতাম তুমি উপবাসী, বিশ্বাস করো, আমি কখনই—

দুই পাঁজরের মধ্যে প্রমিতা কি ব্যথা পেল! নইলে নিখিলেশের কথার ওপরেই বা বলল কেন—আজ উপোসী ছিলাম বলেই বোধ হয় তোমার কষ্টটা এমন সহজভাবে বুঝতে পারলাম।—চল এবার যাওয়া যাক!

—চল। যেন আচমকা কথাটা বেরিয়ে এল নিখিলেশের মুখ দিয়ে।

পথে এসে বলল প্রমিতা—কোথায় উঠেছ?

—আরদালী বাজারের কাছে হোটেলে।

—খাওয়া ঠিক হচ্ছে ত?

—চলে যাচ্ছে।

গলিটা এসে গেছে। প্রমিতাকে দাঁড়াতে হল। এবার যে যেতে হবে। কি বলতে গিয়ে নিখিলেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল প্রমিতা।

একদল লোক হৈ হৈ করে চলে গেল। বোধ হয় বিশ্বনাথের শয়ন আরতি দেখে ফিরছে। একটু নিরিবিলি হতে প্রমিতা কথাটা পাড়ল। —স্ত্রী কেমন আছে?

—সেও ত আসতে চেয়েছিল। মাকে, তোমাকে দেখতে তার ভারী ইচ্ছে।

—বেশ ত, সময় মত একবার নিয়ে এস।

—সময় মত! নিরুৎসাহভাবে বলল নিখিলেশ—তা কি করে হবে?

সময় নিল প্রমিতা। কি ভেবে বলল—আমি জানাব। আজ আসি, কেমন?

নিখিলেশকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল প্রমিতা। একা দাঁড়িয়ে নিখিলেশ। অন্ধকারে বিলীয়মান নিঃসঙ্গিনী নিজের কাঁধে গুরুদায়িত্ব তুলে নেওয়ায় যথার্থ ই সে চিন্তামুক্ত হল না, আর এক নিদারুণ সমস্যায় জড়িত হল, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

—চলুন? কোথায় ছিল অন্তু, এতক্ষণে নিখিলেশের পাশে এসে দাঁড়াল—রাত যে অনেক হল?

বিশ্রি অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে এই গোটা একটা মাস প্রমিতার কাটল। মানসিক প্রতিক্রিয়ার ছাপ যে পড়েনি তার দেহে এমন নয়। চোখের কোলে কালি, অনুজ্জ্বল গাত্রবর্ণ—সহজেই ধরা পড়ে দৃষ্টিতে। অথচ বর্তমান অবস্থার সঙ্গে প্রমিতার এই হতশ্রী রূপটা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরঞ্চ তার তনুশ্রী চিত্তাকর্ষক হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর কাজ সে পেয়েছে—সম্মানে অর্থে লোকের কাছে বলার মতন। বিশুদ্ধ হিন্দি উচ্চারণ এবং পাঠচাতুর্য হেতু, বিশ্বনাথগঞ্জের রাম-মন্দির কর্তৃপক্ষরা প্রতি রবিবার সসম্মানে নিয়ে যায় তাকে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ শোনার আগ্রহে। বিনিময়ে যা দেয়, তা আশাতীত। এর পরেও ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা হেতু শরীর শীর্ণ হওয়া, সে যেন রাজেশ্বরীর ভিখারিণী হওয়া। বলা বাহুল্য, এছাড়াও আছে গোরা ডাক্তারের নিত্য সঙ্গ—কোন কিছু অভাবের যিনি মূর্তিমান প্রতিপূরক! তবে কেন এ কৃশতা? এ' তবের উত্তর ত বিনিদ্র রজনী শেষে, ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে এখন যে চেয়ে আছে দেওয়ালে টাঙান ক্যালেণ্ডারের আজকের তারিখটির দিকে, সেই শুধু বলতে পারে।—

শরীর অসুস্থ অজুহাতে প্রমিতা আজ স্কুল গেল না। সারা

সকালটা সুধাময়ীকে শোনালো শিব-বন্দনা। যথাসময় সুধাময়ীকে স্নান করিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিল পথ্য। আনন্দিকে দিল ছুটি এবেলার মতন। আহার চুকিয়ে রান্না-ঘরের শিকল্ তুলে পড়ন্ত বেলায় প্রমিতা এল সুধাময়ীর ঘরে।

দিবা নিদ্রায় অভ্যস্ত নন সুধাময়ী। পিঠে বালিশ রেখে তখন তিনি পড়ছিলেন চৈতন্য-চরিতামৃত। তাক্ থেকে একটা বই টেনে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে প্রমিতা বসল সুধাময়ীর পায়ের কাছে। ভিজে চুলটা দিলে মেলে।

এক সময় ভারী গলার স্বর শোনা গেল নিচের তলায়।

—টাকা!

পাঠ বন্ধ করে সুধাময়ী যে তার দিকে চেয়ে আছেন, চোখ না তুলেও বুঝল প্রমিতা। চৈতন্য-চরিতামৃত রইল পড়ে এক পাশে!

ততক্ষণে ঘরে এসে গেছে পোষ্ট-অফিস পিওন। প্রমিতা বই রেখে ফর্মে সই দিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা গুণল একমনে। সম্মতিসূচক হেসে পিওনকে বিদায় দিল তারপর। প্রমিতা যেন টাকা আসার অপেক্ষায় বসেছিল এতক্ষণ।

—টাকাটা কে পাঠাল মা?

—আপনার ছেলে। বইটা নিয়ে নিজের জায়গায় বসল প্রমিতা।

—নিখিল?—কিন্তু আমি যে তাকে মানা করে দিয়েছিলাম?

বইটা শেষ করার আগ্রহে প্রমিতা যেন আরো নিবিষ্ট হল।

চোখ থেকে চশমাটা নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন সুধাময়ী।

—সে না হয় আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করলে, কিন্তু তুমি অমান্য করলে কী করে?

প্রমিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতে আবার বললেন সুধাময়ী।

—টাকাটা হাত পেতে নাও কোন সাহসে?

—সাহস নয় মা, প্রয়োজন। যথাসম্ভব শান্তভাবে বলল প্রমিতা।

—কার তা জানতে পারি ?

—সবায়ের।

—তা দেখার প্রয়োজন কি তোমার—আমি বেঁচে থাকতে ?

সুধাময়ীর প্রশ্নে প্রমিতা কিছুটা বিব্রত হল, কিন্তু বলল একইভাবে, —একটা কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না মা, ছেলের টাকা মা নেবে নাই বা কেন ?

সুধাময়ী আরো সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—যে ছেলের কাছ থেকে আমার কুলবধূকে এক কাপড়ে চলে আসতে হয়—দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মা হয়েছি বলেই কি তার টাকায় ভাত পেটে ঢোকাতে হবে ? তুমি হলে কী করতে বৌমা ?

—কিন্তু তিনি—অত্যুগ্র আবেগে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল প্রমিতা।

—কী তিনি ? প্রমিতার কথার সূত্র ধরলেন সুধাময়ী—কী তিনি—বল ? বইটায় চোখ রেখে বলল প্রমিতা—এক কাপড়ে চলে আসতে হয়নি, চলে এসেছি। সেদিক থেকে তার কোন কার্পণ্যই ছিল না।

—ছিল না যখন তাহলে—

—আমি নিতে পারিনি। অসহ্য তিক্ততায় প্রমিতা যেন ককিয়ে উঠল সুধাময়ীর কথার মধ্যে।

—তুমি যা নিতে পারনি, তাই আমারও নেওয়া চলে না। আমায় অপমান করার প্রায়শ্চিত্ত সে করুক। টাকাটা কালই তুমি ফেরৎ পাঠাবে ?

—কিন্তু মা, তিনি ত আপনাকে অপমান করেননি ?

সুধাময়ী আশা করেছিলেন আলোচনা এইখানেই শেষ। কিন্তু প্রমিতার প্রতিবাদ যেন তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। বললেন—অপমান করেনি ? আমার বর্তমানে আমারই হাতে গড়া বৌকে ত্যাগ করাটা বুঝি আমায় সম্মান দেওয়া ?

হাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। একটু দম নিয়ে বললেন আবার।

—আমার নিষেধ করা চিঠির কী সম্মান সে দিয়েছে ?

—আপনার চিঠি তাঁর হাতে পড়লে কী করতেন বলা শক্ত।

—সে চিঠি সে পায়নি ?

—আমি দিইনি।

—তুমি ? পা-টা টেনে নিয়ে সুধাময়ী খর দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন—কেন দাওনি জানতে পারি ?

বইটা পাশে রেখে প্রমিতা ধীর স্বরে বলল—দিইনি তার কারণ আমি। চিঠিটা তাঁর হাতে পড়লে আপনার সম্মান হয়ত থাকত—কিন্তু আমার ? গোটা চিঠিতে একটা কথাই শুধু ছিল, "বৌমার মুখ চেয়ে তুমি এ কাজ করো না।" বৌমার মুখ চেয়ে ? এ'টা কী আমায় করুণা করা নয় মা ? আপনার হাতে গড়া বৌয়ের এই ভিক্ষে নেওয়া কী সম্ভব ? হাত পেতে তাই নিলে হয়ত রেণী-পার্কে থাকতে পেতাম, আপনার নিষেধ অমান্য হত না, কিন্তু আমার মর্যাদা কী থাকত ? চিঠিটা তাই আমি দিইনি আপনার ছেলেকে।

মনে পড়েছে সুধাময়ীর ওই কথাটা বার চারেক উল্লেখ করেছিলেন নিখিলেশকে লেখা চিঠিতে। বিবাহিত পুত্রের এই অধঃপতন সংবাদে যে-কোন মা-ই অমন কথা উল্লেখ করে পুত্রবধূর জন্যে। কিন্তু যার জন্যে এই প্রার্থনা করা, তার কাছে কী রূপ নেবে, দিশেহারা সুধাময়ী এতটা দূর থেকে তা উপলব্ধি করতে পারেননি সত্যি—কিন্তু শুধু চিঠি পাঠিয়েই কী তিনি শাশুড়ির কর্তব্য শেষ করেছিলেন ? প্রচেষ্টা কী কিছুই ছিল না আর ? কলকাতায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে সব কিছুই ত নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন সসম্মানে। কিন্তু বাধা ত এসেছিল প্রমিতার দিক থেকে। নিষ্ফল ব্যর্থতা আবার মাথা চাড়া দিল। বললেন তিনি —মানলাম তুমি যা বলছো—কিন্তু চিঠিটাই সব কিছু নয়। আমি আরো কিছু চেয়েছিলাম, যাতে তোমার মর্যাদা থাকে। কিন্তু তুমিই তা হতে দাওনি ?

শাশুড়ির রোগ-শীর্ণ মুখের বীভৎস আকার, ভগ্নস্বর প্রমিতাকে শঙ্কিত করে তুলল। যতদূর সম্ভব শান্তভাবে বলল—তার কারণ আমাকে অমর্যাদার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টাটাই ত আপনার পক্ষে অসম্মান। আমি নিজে যেখানে অতিরিক্ত, সেখানে আপনার উপস্থিতির সাহায্য নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা—আপনার-আমার দুজনের পক্ষেই অসম্মান।—জল সরে গিয়ে সেখানে পাঁক বেরিয়েছে, সেখানে স্নান করা মানেই নতুন করে কাদামাখা।

প্রমিতার এমন কণ্ঠস্বর এই যেন প্রথম শুনলেন সুধাময়ী। চোখে চশমাটা দিয়ে বললেন—ঠিক কথা। তবু এ' ক্ষেত্রে তোমার একটা আত্মযুক্তি আছে—আমার কী আছে মা? বিনা অপরাধে আমারই হাতে গড়া বৌ অতিরিক্ত হবে আর তাই যদি মেনে নিই, তবে মিথ্যে আমার কাশীবাস। টাকাটা না নেওয়ার একটা প্রতিবাদ জানিয়ে আমায় মরতে দাও! এ'টাকাটা আর তুমি ছুঁও না, বৌমা? সুধাময়ী নিজের হাতের মধ্যে প্রমিতার হাতটা ধরলেন এবার।

সুধাময়ীর তীব্র যুক্তির বিপক্ষে প্রতিবাদ করবার শক্তি কে যেন এতক্ষণ প্রমিতাকে যুগিয়ে আসছিল ভিতর থেকে। কিন্তু এই মুহূর্তে এমন বেদনার্ত কণ্ঠের-সকাতর মিনতি প্রমিতাকে অসাড় করে দিল। শাশুড়ির মিনতি রাখবার প্রতিশ্রুতি দেবার উদ্দেশ্যে মুখ তুলতেই, সুধাময়ীর মুখের আদল আর এক মুখ প্রমিতার দৃষ্টিতে দেখা দিল বিদ্যুৎ চমকের মতন। নিভৃত মন্দির চত্বরে স্তিমিত আলোর তলায় সেই অসহায় করুণ মুখ—এই ত মাত্র একমাস আগে দেখা, সে কী ভোলবার? টাকা পাঠানোর ভরসা পাবার পর অন্তর্দাহে দীর্ণ সেমুখের কী স্বর্গীয় দীপ্তি!

—মা?

—কিছু বলবে?

—আমি যে কথা দিয়েছি?

—কথা দিয়েছ? কাকে?

—আপনার ছেলেকে।

—অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সুধাময়ী। এও কী সম্ভব?

—কোথায় দিলে কথা?

—এইখানে।

প্রমিতার মুখ থেকে কথাটা যেন কেড়ে নিলেন সুধাময়ী।

—এইখানে, মানে কাশীতে?

—হাঁ মা।

—এসেছিল কবে?

—গত মাসে। এতক্ষণে প্রমিতা যেন বলবার মতন জোর পেয়েছে।

—তখন আপনি আরে অসুস্থ ছিলেন।—তিনি কিন্তু আপনাকে দেখতে চেয়েছিলেন। আমি—

নিখিলেশের মাতৃদর্শন ব্যাকুলতায় সুধাময়ীর কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হবে নিশ্চয়ই, এই আশায় প্রমিতা যেন উদগ্রীব হয়ে উঠল।

প্রমিতার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে দিলেন সুধাময়ী—ভিক্ষে দিতে এসেছিল বুঝি? নিখিলেশের অভাবে যেন প্রমিতার উপরই আক্রোশটা ফলালেন তিনি।

—ভিক্ষে দিতে নয় মা—বরঞ্চ চাইতে এসেছিলেন।

—কী চাইতে এসেছিল?

—এক জনের ইচ্ছে করে শেষ হওয়া আর একজনের তাই অসহায় ভাবে দেখার প্রতিকারের ভিক্ষে চাইতে এসেছিলেন।

নিভে আসা হোম-কুণ্ডে যেন ঘি পড়ল। জ্বলে উঠলেন সুধাময়ী—সে কী ভেবে রেখেছে, তার ভিক্ষে দেওয়া টাকায় তার মার অন্ন জুটছে? আজিই চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়ে দাও, তার বাপ যে কটা টাকা রেখে গেছে, তাতে তার মার মণিকর্ণিকায় যাবার দিন পর্যন্ত চলে যাবে। আনন্দি, একটা পোষ্ট কার্ড আনত?

কিসের অপেক্ষায় প্রমিতা যেন এতক্ষণ প্রহর গুণছিল। শাশুড়ির হাতটা এবার নিজেই ধরে বলল—সেই টাকায় ত শুধু

আপনার যাবে, কিন্তু আপনি কী শুধু আপনাকে নিয়ে? বছরের পর বছর আপনাকে আঁকড়ে যারা প্রাণে বেঁচে আছে—তাদের কী হবে? এই স্বামীহারা আনন্দি, নিঃসন্তান অতুলের মা, অন্ধ শুকলাল, কৈলাসবাবুর বিধবা স্ত্রী? তারপর ওই কালীতলার দিদি, সৎকার সমিতির চাঁদা, কেদার ঘাটের ভিখিরীর দল, এমন কী গোড়েন ঘাটের কুকুরগুলো পর্যন্ত—এরা খাবে কী? কার দরজায় দাঁড়াবে—একবার ভেবে দেখেছেন কী? মা ছেলের বিবাদটাই বড় হবে—আর এতগুলো প্রাণ শুকিয়ে মরবে এই কাশীতে? আপনার এতদিনের ব্রত কী সেই নির্দেশ দেয়?

হাঁপিয়ে পড়েছে প্রমিতা। কিন্তু আশ্চর্য! এতটুকু বিরতি না দিয়ে সুধাময়ীর চোখে চোখ রেখে বলল আবার—আপনাকে আজ একটা কথা বলি মা, শুধু আপনার কেন, এই টাকা মাস-মাস পাঠিয়ে তিনি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাঁর ত্যাগ করা স্ত্রীরও ভরণপোষণ চলছে—সত্যি বলতে কি, তাতেও আমার অপমান নেই! তবু জানব—এই কাশীতে, ওই টাকায় এতগুলো লোকের ভাতকাপড় জুটছে। এর পরেও ছেলের টাকা নেওয়ায় যদি মার আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়—তবে কাল কেন? বলুন ত আজিই এখনি টাকাটা ফেরত পাঠাই?

প্রমিতার গর্ব-দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়ে সুধাময়ী সবিস্ময়ে দেখলেন ঘরের মধ্যে গোরা ডাক্তার।

—অপরাধ নিওনা ছোটমা। সহাস্যে বললেন ডাক্তার,—মায়ে-ঝিয়ের ঝগড়া ওই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। চলেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার ঝগরাটে বৌ আমায় যেন টেনে আনলে। কিন্তু—

শশব্যস্ত ডাক্তার এগিয়ে এসে সুধাময়ীর নাড়ি ধরেই ইসারায় প্রমিতাকে কি বললেন। প্রমিতা তৎপর কাঁচের গেলাসে জলের সঙ্গে ওষুধ দিয়ে ধরল সুধাময়ীর মুখে। স্টেথিস্‌কোপ লাগিয়ে ডাক্তার ডাক্তারি পর্যবেক্ষণ সুরু করলেন। গেলাস রেখে প্রমিতা ধরল হাতপাখা সুধাময়ীর শিয়রে। কিছুটা সময় কাটল।

—বয়েস হয়েছে ; এক সময় ডাক্তার বললেন—কেন যে নিজেকে তিক্ত করে তোল বুঝি না ছোটমা! আরে এটা দেখতে পাচ্ছো না, যার জন্যে ছেলের আসার সদর-রাস্তাটা তুমি বন্ধ করে দিতে চাইছো,—সেই কিনা খিড়কির দরজাটা খুলে রেখেছে। বড় অদ্ভুত!

হেঁট হয়ে কপালে পড়ে থাকা সুধাময়ীর রুক্ষ চুলগুলো সস্থানে রাখতে রাখতে রাডাক্তার প্রমিতার উদ্দেশ্যে বললেন—তোমার তালিকা কিন্তু অসম্পূর্ণ!

এতক্ষণে হাঁপ ছাড়ল প্রমিতা। প্রগলভ ডাক্তার যে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন, আরো কি বলতেন কে জানে!

—বুঝতে পারলে না বুঝি? এবার সোজা হয়ে বসলেন ডাক্তার —একটু আগে তোমার শাশুড়ির দানের যে তালিকা মুখেমুখে দিলে, এবার থেকে তাতে আর একটু যোগ করতে হবে। তা হল ভাগ্যবান গোরাডাক্তারের লক্ষ্মীর বরযাত্রীর দল। যাদের ওষুধ ত দূরের কথা, পথ্যই জোটে না। দয়া করে এবার তাদেরও তালিকাভুক্ত করে নিও!

সুধাময়ী চোখ তুলতেই দেখলেন নিবিড় আগ্রহে প্রমিতা চেয়ে আছে তারই দিকে কোন ইঙ্গিতের আশায়। আনন্দি এল চা নিয়ে। এক সময় চা শেষ করে ডাক্তার তাঁর ব্যাগে জিনিষপত্তর পুরে সুধাময়ীকে বললেন—হাঁ, যে জন্যে অসময়ে আসা। ভবেশের কী করা যায় বল ত, ছোটমা?

উদ্বিগ্ন কাতর স্বরে বললেন সুধাময়ী—কী হয়েছে তার?

—বিশেষ কিছু নয়। বাড়ি ভাড়া বাকি মাত্র ছমাসের। পাণ্ডার বাড়ি। জানই ত, তাদের দয়ামায়ার কাছে তোমার বুড় শিবও হার মানে। কোর্ট থেকে একেবারে যমদূত এনে ছমাসের ভাড়া ছেড়ে দেবার মহত্ব দেখাচ্ছে জিনিষ-পত্তর রাস্তায় ফেলে দিয়ে। এতক্ষণ বোধহয় ভবেশটা মাগ-ছেলের হাত ধরে গাজনের গান ধরেছে—যা করেন বাবা বিশ্বনাথ! তাইত এলাম তোমার কাছে—এ যাত্রায়

বিশ্বনাথের মুখ তুমিই রাখ ছোটমা! সামান্য ব্যাপার, তাই আর বড়মাকে বিরক্ত করতে গেলাম না।

সায়াহ্নের আকাশের দিকে- দৃষ্টি ফেরালেন সুধাময়ী। এদিকে ডাক্তার যাবার জন্য প্রস্তুত। বড় অস্বস্তিতে পড়ল প্রমিতা। এক সময় সুধাময়ী দৃষ্টি ফেরালেন প্রমিতারই দিকে। এবারও কথা রইল অনুচ্চারিত। কিন্তু কী ইঙ্গিতে প্রমিতা যে ক্ষিপ্র হাতে বালিশের তলায় রাখা নোটের বাণ্ডিলটা নিয়ে ডাক্তারের সামনে মেলে ধরল তা শুধু সে-ই বলতে পারে।

খানচারেক দশটাকার নোট তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন—আপাততঃ এতেই হবে। এখন চলি!

ক্যাম্বিসের ব্যাগটা নিয়ে আর একবার সুধাময়ীর নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন—আর একটিও কথা নয়।

দু'পা গিয়ে আবার ফিরলেন তিনি। বললেন—ঘটনাচক্রে—সেটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলতে পারি না ছোটমা, তবে অনেকের মা হয়ে যখন বসেছ, তখন এক ছেলেকে শাস্তি দিতে গিয়ে অপর ছেলেদের ওপর অবিচার করো না। চলি আজ!

বারান্দায় প্রমিতাকে দেখেই ডাক্তারের গলা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারিত হল—'ইয়া!' প্রমিতার সাজা পান একটি একটি করে সব কটি মুখে পুরলেন ডাক্তার।

—একটা কথা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল প্রমিতা।

—যথা?

—আজই শুনলাম বড়মার কথা। তিনি কী আপনার—

—মা! পিকটা গিলে ডাক্তার বললেন—তবে গর্ভধারিণী নন; তোমার শাশুড়ি-মাঠাকরুণ কাশীতে আসার পর বড় অসুবিধেয় পড়েছিলাম দুই মাকে নিয়ে। ডাকার সুবিধের জন্যে বড় আর ছোট ডাকটা লাগিয়ে দিলাম—এই আর কি।

—তিনি কী আপনার কাছেই থাকেন? কৌতূহল চাপতে পারল না প্রমিতা।

—মা নিজের বাড়িতে।

—কোথায়?

—কোথায়? সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন ডাক্তার—ওদিকে ডবেশটা যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, আর একদিন বলব! বড়-বড় পা ফেলে ডাক্তার নেমে গেলেন। পায়ে-পায়ে প্রমিতা এসে দাঁড়াল সুধাময়ীর শিয়রে। নত হয়ে এক সময় বলল প্রমিতা—এখন কেমন বোধ করেছেন মা?

সুধাময়ীর শুষ্ক ওষ্ঠে হাসির আভাষ। শীর্ণ হাতে তিনি প্রমিতার এলোমেলো চুলগুলি গুছিয়ে দিতে লাগলেন।

কাশীর শীত তার উপহার-সম্ভার নিয়ে বাজার জমিয়ে বসেছে। স্বাস্থ্যান্বেষী, পর্যটক আর তীর্থ-যাত্রীর আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। বিরাম নেই ব্যবসায়ীদের, মিষ্টিওয়ালার আর মাঝি-মল্লাদের। তবু জনশ্রুতি এই—কাশী নাকি তার স্বর্ণময় যুগ হারিয়ে ফতুর হয়ে গেছে অনেকদিন।

প্রতি মাঘীপূর্ণিমায় সুধাময়ী উৎসব পালন করেন। বাঙ্গালীটোলা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে সারা বছর এই দিনটার প্রতীক্ষায়। এবার সুধাময়ী অসুস্থ। উৎসব-দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিয়েছে প্রমিতা ও আনন্দি।

সুধাময়ীর ইচ্ছা প্রমিতা যেন নিজে গিয়ে তাঁর কালোকে নিমন্ত্রণ করে আসে।

ঘরের কাজ সেরে অপরাহ্ণ বেলায় প্রমিতা এলো পুষ্প-দন্তেশ্বরে—ডাক্তারের বাসায়। কড়া নাড়তে এসে দাঁড়াল মুন্নি-মা। দেহাতী বৃদ্ধা। মুন্নি-মা শুধু রাঁধুনী নয় অভিভাবিকাও।

—ডাক্তার বাবু আছেন?

—নেহি ম্যায়ী!

—কব লোটেঁগে?

—বিশ্বনাথ জানে। আজ নেহিভি আ সেকৃতা।

—নেহি ভি আ সেকৃতা?

—ওই ত বাত। তিন রোজ ত হো গিয়া।

তিন দিন? প্রমিতা জিজ্ঞেস না করে পারল না—লেকে৹ বিমারি কোন?

—বড়ি মাঈ!

বড়মা? অসুখ নিশ্চয়ই গুরুতর—নইলে তিনদিন থাকতে হয়েছে। আরো ক'দিন হবে কে জানে। একটু ইতস্ততঃ করল প্রমিতা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তা হোক। মুন্নি-মার কাছ থেকে বড়মার ঠিকানা নিয়ে কালীতলার মোড়ে রিক্সায় চেপে বসল প্রমিতা।

রিক্সা থামল যেখানে—সেটা চক। এখানে কখন আসেনি প্রমিতা এর আগে। সবকিছু দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। কাশীর মধ্যে যেন আর একটা কাশী। এতদিন যে-কাশীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল—গঙ্গায় স্নান, মন্দিরে মন্দিরে দেব-দর্শন বিশ্ব-নাথের আরতি, কেদারের পূজা, দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকের ভাগবত ব্যাখ্যা বাঙালী টোলের প্রতিবেশীদের জীবন-ধারণের অতি তুচ্ছতার মধ্যেও নিবিড় আনন্দ। এখানে শুধু সংগ্রামের উৎকট নগ্নতা। কাশীর ঐতিহ্য যেন প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছে। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে জনারণ্যের মধ্যে একজনকে ধরে প্রমিতা জিজ্ঞেস করল গলিটা কোথায়? আশ্চর্য! সামান্য একটা গলির অবস্থান জানতে চাওয়ায় কী এমন অপরাধ হল যে লোকটা হ্যাঁ হয়ে গেল!

—আপ কাঁহা জায়েঙ্গা? ট্যেরা চোখে লোকটা জানতে চাইল প্রমিতার আপাদ মস্তক দেখে।

—আপকো ত ব্যাতা থা। রাগে যেন গরগর করে উঠল প্রমিতা।

—আপ কিসকো পাশ জায়েঙ্গা—অহি পুচতা?

—গোরা ডাক্তার বাবুকো পাশ।

—ডাক্তার বাবু? লোকটা আর একবার প্রমিতাকে দেখে বলল —আপ আইয়ে?

গলিতে এনে নম্বর মিলিয়ে লোকটি যে-বাড়ির সামনে এসে

প্রমিতাকে দাঁড় করাল—থাক থাক বারান্দা বার করা এক অদ্ভুত ধরনের তেতলা বাড়ি। আশ্চর্য লাগল প্রমিতার এ মহল্লার সব বাড়ির প্যাটার্ণ একই রকমের দেখে। সঙ্গে সঙ্গে গা-টা রি-রি করে উঠল ওইসব বারান্দার অধিবাসিনীদের দেখে। গড়-গড়ার নল মুখে দিয়ে মেয়েমানুষ প্রকাশ্যে বসে থাকতে পারে এও কী সম্ভব!

—এই বাড়ি। আপ ভিতর যাইয়ে?

বাঁচা গেল। রাস্তার লোকগুলোর কিম্ভূতদৃষ্টি থেকে রেহাই পেল এতক্ষণে। গায়ের চাদরটা জড়িয়ে প্রমিতা এক ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

নিচেটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। ধারে কাছে নেই কেউ। বাঁ-হাতি সরু সিঁড়ি দিয়ে তরবড়িয়ে ওপরে এসে প্রমিতা এ বাড়িতে যার প্রথম দেখা পেল—সে যুবতী, স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী। শাড়ি পরার ধরনেই বোঝা গেল সে অবাঙালী। কাচের প্লেটে কিছু বরফ নিয়ে বোধ হয় ওপরে যাচ্ছিল।

—ডাক্তার বাবু?

প্রমিতা থতমত খেয়ে গেল যুবতীটির অত্যাশ্চর্য চাহনি দেখে। কি বিপদ! মেয়েপুরুষ সকলেরই কি একই রোগ! এ মহল্লাটাই যেন কেমনতর! ডাক্তারের বড়মা থাকেন কী করে?

—আপ আইয়ে! যুবতীটি আহ্বান জানাল। প্রমিতা তেতলায় একটা বড় ঘরের চৌকাঠের কাছে এসেই যেন চলৎ-শক্তি হারাল।

মারবেলের মেঝের ওপর বিছানায় শায়িতা এক বৃদ্ধা—মৃতা কী জীবিতা বোঝা শক্ত। তারই মুখের কাছে নত হয়ে গোরাডাক্তার কী যেন লক্ষ করছেন তন্ময় ভাবে। বরফের প্লেট রাখার শব্দে ঘাড় ফেরাতে ডাক্তারের দৃষ্টির বিনিময় ঘটল প্রমিতার সঙ্গে।

—এস! বলেই ডাক্তার রুগিণীর মুখে দিলেন ছোট একটা বরফের টুকরো।

মামুলী অভ্যর্থনা! প্রমিতার এ' বাড়িতে আসা যেন নিত্য-দিনের! আহ্বান পাওয়া সত্বেও প্রমিতা এগুতে পারল না এক পাও!

—পেটে কিছু আছে, না একদম খালি ? আর এক টুকরো বরফ রুগিণীর মুখে দিয়ে বললেন ডাক্তার এক সময়।

কি সৃষ্টি ছাড়া কথা! প্রমিতা জ্বলে উঠল। সে কী তবে গিলতে এসেছে এখানে।

—যা করছেন করুন! না বলে পারল না প্রমিতা।

ডাক্তার বৃদ্ধাকে মোলায়েম ভাবে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়ে বললেন—আরে সেটা তোমার খাতিরের জন্যে নয়, সাবধানের জন্যে। চল, বরঞ্চ আমরা পাশের ঘরে যাই। রুক্মিণী, চায়ের জল চড়াও ?

প্রমিতার যেটুকু বিস্ময় বাকি ছিল পূরণ হল ডাক্তার যখন উঠে দাঁড়ালেন। পরেছেন গোলাপী সিল্কের বৃন্দাবনী শাড়ি দুপাট করে লুঙ্গির মতন। হাত কাটা গেঞ্জী গায়ে। মাথা ভরতি রুক্ষ এলো-মেলো চুল। এইবেশে এক দীর্ঘকায় পুরুষ দেখবার বস্তু কিনা বলা শক্ত। কিন্তু প্রমিতার দৃষ্টি পলকহীন।

পাশের ঘরটায় আগাগোড়া গালচে পাতা। চার দেয়ালে রূপোর ফ্রেমে বাঁধা আয়না। সিলিংয়ে ঝুলছে পিতলের চেনে টাঙানো বিরাট ঝাড়। এক পাশে পুরাণ আমলের সোফা। দুজনে তাতে বসল পাশাপাশি।

—মুন্নিমার মুখে শুনলাম আপনার বড় মা অসুস্থ। কিন্তু—

—কিন্তুটা কী ? হাসলেন ডাক্তার।

সামনে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে দেখে ফস করে প্রমিতা বলে বসল—এই কী আপনার বড়মার বাড়ি ?

—অনুমান নির্ভুল।

—কিন্তু তিনি কোথায় ?

—কে ?

—আপনার বড়মা!

—পাশের ঘরে যাঁকে শুয়ে থাকতে দেখলে।

ঠিক সোমের মুখে সুরটা কেটে গেল আচমকা। প্রমিতার

চিত্তলোকে যে মূর্চনা চলছিল এতক্ষণ অনুপম ছন্দে, ডাক্তারের বড়মা—সূচী শুভ্রা, সৌম্যদর্শনা, প্রিয়ভাষিনী এমন এক মহীয়সী রমণীর দর্শন আশায়—মুহূর্তে থিতিয়ে গেল। একটা তিক্ততা যেন তার গলা অবধি ঠেলে উঠল। এখন এ বাড়ি থেকে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

কটাক্ষে একবার দেখল প্রমিতা, ডাক্তার প্রসন্ন আননে বসে বসে পা নাড়াচ্ছেন। রুক্মিণী এল চা-জলখাবার নিয়ে। পরিষ্কার বাংলায় রুক্মিণী প্রমিতাকে বলল—এ ঘরে আপনি স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

ডাক্তার উঠে আলোটা জ্বেলে বললেন—আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি। তুমি ততক্ষণ আরম্ভ করো প্রমিতা। এলাম বলে।

ফিরে এসে ডাক্তার দেখলেন যেমন কার খাবার তেমনি পড়ে।

—হল কী? সদ্ব্যবহার হোক?

—আমায় ক্ষমা করতে হবে।

—কারণ?

উপস্থিত কোন কারণ না পেয়ে প্রমিতা বলল—তার এখনও সন্ধ্যে দেওয়া হয়নি।

—তার অভাব কী? চলে যাও ছাদে ঠাকুর ঘরে—সব পাবে।

—বাড়িতে গিয়েই হবে।

—কিন্তু বিপদে ফেললে আমায়?

—কেন?

—একজনকে অভুক্ত রেখে গিলি কি করে বল?

—অভুক্ত আপনি রাখছেন না—আমিই অক্ষম।

—ও তাহলে জোর করা চলে না। খাই?

—স্বচ্ছন্দে।

ডাক্তার ত নিজের অংশ শেষ করলেনই, প্রমিতার অংশও—তাও বাদ দিলেন না। শেষ সন্দেশটা যখন মুখে পুরলেন, প্রমিতার মনে হল এ ভক্ষক যেন কোন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত দেশ থেকে এসেছে এইমাত্র।

নিছক সামাজিকতা রাখতে প্রমিতা বলল—অসুখটা কী ?

—কলেরা।

এবার চায়ের পালা। মুখে পোরা সন্দেশের শুষ্কতায় ডাক্তার বোধ হয় বেসামাল হয়েছিলেন। এক চুমুক চায়ের সাহায্যে তা দ্রবীভূত করে বললেন—অবশ্য পুরোপুরী না হলেও কতকটা ত বটেই, তাই না রুক্মি ?

কলেরা !

প্রমিতা ত তার দেহটা নিয়ে এখানে বসে আছে, মন ত কখন চলে গেছে কেদারঘাটের বাড়িতে। এবার তাও যেন অসাড় হয়ে গেল। শোনা আছে একজনের কলেরা আক্রমণে সারা বাড়ি নাকি বিষিয়ে ওঠে। পাশের ঘরে সংক্রামক ব্যাধি, এ ঘরে চায়ের সঙ্গে মৌতাত করে কী করে ডাক্তার হয়ে? আর একবার প্রমিতা যেন ঝলসে উঠল ভেতরে ভেতরে।

চা শেষে ডাক্তার বললেন—অবশ্য অসুখটা ঠিক সময়ে ধরা পড়ল বলে, এ যাত্রায় ভবপারের নোটিশ প্রত্যাহার হল। কি বল রুক্মি ?

—তা জানি না। সপ্রতিভ রুক্মিণী উত্তর দিল—আপনি ঠিক সময় এসেছিলেন তাই জানি।

—তাহলে এ'কদিন খুব পরিশ্রম গেছে আপনার ? কথা বলার জন্যেই যেন বলল প্রমিতা।

—কী গেছে এ ক'দিন বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ, ছোটমা কেমন এখন ?

—অনেকটা ভাল।

রাত হয়ে আসছে, প্রমিতা বলল—এবার আমি যাব !

—আমাকেও ত যেতে হবে রাজঘাটে বড়মার গুরুদেবের কাছে আর কিছু ওষুধ আনতে। এক মিনিট প্রমিতা, রাজবেশটা বদলে আসি।

ফিরে এলেন ডাক্তার নিজের দৈনন্দিন সাজে। রুক্মিণী ইতিমধ্যে

পান নিয়ে হাজির। যতগুলো পারলেন এক সঙ্গে মুখে পুরে বললেন—চল এবার যাওয়া যাক!

—আপনি কী চলে যাচ্ছেন? ভেঙ্গে পড়া গলায় প্রশ্ন করল রুক্মিণী।

—আপাততঃ বড়মার গুরুদেবের কাছে, পরে গোধূলীয়ায় কিছু ওষুধ আনতে, এই ধর ঘণ্টাতিনেকের মতন। হ্যাঁ, পরিশ্রমের কথা বলছিলে না প্রমিতা, ওটা গেছে এই মেয়েটার ওপর দিয়ে। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—আপনার কাছে আমি? প্রতিবাদ করল রুক্মিণী। ডিশে পড়ে থাকা বাকি পানগুলো মুখে দিয়ে ডাক্তার বললেন—আরে, ওই ত আমাদের কাজ।

—মার মল-মূত্র ফেলাও কী আপনার কাজ? ক্ষুব্ধ ব্যথায় যেন ফেটে পড়ল রুক্মিণী—মা কত দুঃখ পাবেন বলুন ত যখন শুনবেন আপনি—

—না শোনালেই হল। চল প্রমিতা!

রুখে উঠল রুক্মিণী—আমাকে বলতেই হবে, নইলে আমার—

—পাপ হবে! কেমন! রুক্মি, কোনদিনই আরামের পথে মাতৃঋণ শোধ হয় না। সে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা ছেলের মধ্যে দেখে সব মা ই কষ্ট পায়। যাক। তুমি এবার কিছু মুখে দাও। এস প্রমিতা?

সম্বিতহারা প্রমিতা ডাক্তারের ডাকে যেন চমকে উঠল। পিছন থেকে অনুরোধ জানাল রুক্মিণী প্রমিতাকে—সময় পেলে আবার আসবেন।

—আরে দেখেছ! ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার—তোমাদের পরিচয়টা এখনও—এর নাম ত শুনলে প্রমিতা। কি ভেবে ডাক্তার আবার বললেন—বড়মার মেয়ে—এই আমি যেমন তাঁর ছেলে! আর প্রমিতার পরিচয় হল—

—আমি জানি। সরল মুখে বলল রুক্মিণী—আপনিই একদিন বলেছেন।

—বলেছি বুঝি ?

অনেক কিছু এ বাড়িতে খটকা লাগার মত এটাও একটা প্রমিতার কাছে। কৈ এতদিন এত কথার মধ্যে রুক্মিণীর নামটা পর্যন্ত ডাক্তার উল্লেখ করেননি অথচ তার কথা রুক্মিণীর কাছে অপ্রকাশ রাখেননি। আশ্চর্য ! রুক্মিণীকে নমস্কার জানিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে প্রমিতা এসে দাঁড়াল রাস্তায়।

এখন রাতের প্রথম প্রহর। দু একটা বাড়ি থেকে বামাকণ্ঠের গান শোনা যাচ্ছে, কোন আস্তানা থেকে ঘুঁঙুরের। গলিটা যেন আরো লোক সমাগমে গমগমে হয়ে উঠেছে। ডাক্তারের ডাকে প্রমিতা উঠে বসল সাইকেল রিক্সায়। এবার রিক্সা চললো উত্তরমুখো।

—হল কী ? এমন চুপচাপ ? প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

—ভাবছি।

—যথা ?

—আপনার বড়মার কথা।

—যেমন ?

—বৃদ্ধা রমণী মাত্রেই মা হন। সেই সহজাত সম্পর্কে কী ইনি আপনার মা, না অন্য কিছু কারণ আছে ?

—একটু ভুল করলে প্রমিতা। রিক্সায়ালাকে রাস্তার নির্দেশ দিয়ে প্রমিতাকে বললেন ডাক্তার—এই বৃদ্ধা যখন পূর্ণ যুবতী, তখনই আমার মা।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রমিতা চাইতেই, তিনি বললেন আবার—বিশেষত্বের জোরে অনেক রমণী গর্ভধারিণী না হয়েও মা হন অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সেই মা-ছেলের সম্পর্ক সম্মানিত হয় না। বরঞ্চ ঘৃণাই প্রকাশ পায়।

—ঘৃণা ?

—হাঁ ঘৃণাই ! এই যেমন তোমার মধ্য থেকে প্রকাশ পেল আজ ও বাড়িতে।

—ওটা সংস্কার। প্রতিবাদ করল প্রমিতা।

—একই কথা। বন্ধুর মা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে দেখেও মার দেওয়া মিষ্টি মুখে করতে পারলে না। তার কারণ? সে যাক্, কি যেন বলছিলে, বিশেষত্ব? বাপ-মা-হারা —বলতে পার একটা পথের ছেলেকে, নিজের খরচায় খাইয়ে-পরিয়ে ডাক্তার করিয়ে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেন। এটা বিশেষত্ব কিনা বলতে পারি না, তবে এই হল আমার বড়মার পরিচয়।

—ঘটনাটা কি জানতে পারি না? বড় ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল প্রমিতা।

—আমি যখন আমার বাবা-মার সংসারে এলাম, তার আগে থেকেই চলছিল টানাটানি। নূন আনতে পান্তা ফুরায়। আগেই বড়ভাই সরে পড়েছিল—বোধ হয় দারিদ্র্য-সুখটা সহ্য করতে না পেরে।—ওরে এই গলি!

ডাক্তারের নির্দেশে রিক্সা ঢুকল বাঁ হাতি নিমগাছওলা গলিতে। জায়গাটা ফাঁকা। পাকা বাড়ি বলতে নেই। রাস্তার পাশেই নর্দমা। গলির শেষে খোলার আটচালা দেওয়া একটা মাটির বাড়ির সামনে রিক্সা দাঁড় করালেন ডাক্তার।

—এলাম বলে! বলেই ডাক্তার ঢুকলেন বাড়িতে। প্রমিতা বসে রইল রিক্সায়। রিকসায়ালা এই ফাঁকে বিড়ি ধরাল।

প্রায় মিনিট দশ বাদে ফিরলেন ডাক্তার। তাঁর হাতে সরু কাগজের বাণ্ডিল ফিতায় বাঁধা। বললেন—নৌকায় ফেরা যাক! চক দিয়ে গেলে সময় লাগবে, ছোটমা হয়ত ভাবতে বসবেন। রিক্সায়ালার পাওনা মিটিয়ে ডাক্তার এলেন প্রমিতাকে নিয়ে রাজঘাটে। ঘাট জনহীন। নৌকায় নৌকায় তখন রান্নার কাজ চলছে। মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ।

ডাক্তার কখন যে মাঝিদের লক্ষভূত হয়েছেন, প্রমিতা বুঝতে পারল উনান রেখে যখন সকলেই ডাক্তারকে ঘিরে ধরেছে নিজের

নৌকায় তোলার আগ্রহে! ওদের মধ্যে একজনের নৌকায় প্রমিতাকে তুললেন ডাক্তার। উজ্জ্বলা উত্তর-বাহিনীতে দাঁড়ের শব্দ উঠল।

সঙ্কটার মন্দির ছাড়বার পরই প্রমিতা স্মরণ করাল ডাক্তারকে—হ্যাঁ, আপনার বড়ভাই মারা গেলেন, তারপর?

—তারপর! সরে এলেন ডাক্তার প্রায় প্রমিতার গা ঘেঁষে।

—সত্যি জানতে চাও?

—চাই।

—কী হবে তাতে?

এতক্ষণে হাসল প্রমিতা। আকাশে ছড়ান জ্যোৎস্নার মতই সে হাসি। বলল—গলায় স্টেথিসকোপ জড়ান একটা লোককেই বাঙ্গালীটোলা দেখে আসছে, আমিও কী শুধু তাই দেখে যাব আমরণ?

হাত বাড়িয়ে গঙ্গার জল নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় বললেন ডাক্তার—আমি আসতেই টানাটানিটা, বুঝতেই পাচ্ছ আরো সাংঘাতিক হল। দারিদ্র্যের চাপে বাবা বোধহয় বাঈজী বাড়ির পুরুতগিরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওরা ত এমনিতেই দান-টান করে বেশী, তার ওপর আছে পুজোয় কাপড়, শাড়ি, শীতে কম্বল, এটা সেটা। দেখতে দেখতে ন'য়ে যখন পা দিলাম, মা-র কাশী-প্রাপ্তি ঘটল—একদিক ফর্সা হয়ে গেল। যথাকালে গলায় সূতোটাও উঠল। স্কুলে পড়ি, দুবেলা হাঁড়িও ঠেলি। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার একমাস বাকি। সকালের দিকে পড়ছি, খবর পেলাম বাবা রাস্তায় দেহ রেখেছেন। ছুটলাম! গিয়ে দেখি, একদিকে জল-কাদায় পড়ে বাবার অসাড় দেহ অন্যদিকে জ্ঞান হওয়া থেকে এই যাঁদের বলে আসছি জ্যাঠা, কাকা, দাদা তাদের মত্ত উল্লাস।

—উল্লাস? নিশ্বাসটা যেন বন্ধ হয়ে এল প্রমিতার।

—হবে না। হাসিহাসি মুখে বললেন ডাক্তার—বাইজী বাড়ির পুরুত মরল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল—মর্ত্যের স্বর্গপুরী কাশী পাপশূন্য হল—উল্লাস ত হবারই কথা! তা হোক, তাতে দুঃখ নেই—কিন্তু দুঃখ

তখন পনের বছরের সদ্য বাপহারা ছেলের বুকটা গুঁড়ো করে দিল, যখন দেখল, তার মৃত বাবা রাস্তায় পচতে থাকবে, তবু সৎকার হবে না।

—কারণ ?

—সেই সনাতন। বাঈজী বাড়ির পুরুতের পাপ দেহ এই কাশীতে ছুঁয়ে কে নরক বাস করবে বল ? কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা কি জান ? ডাক্তার যেন তার বক্তব্য হঠাৎ ভুলে গেলেন। ব্যাস কাশীর দিগন্ত জোড়া মাঠের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

দাঁড়ের শব্দ ছাড়া নিঃসীম নিস্তব্ধতা !

ডাক্তারের উদাস চাহনিতে কি যেন মন্ত্র ছিল—মুগ্ধ প্রমিতার ডান হাতটা যুক্ত হল ডাক্তারের হাতে। অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—কী ঘটনা ?

হাসলেন ডাক্তার, বললেন—আশ্চর্য এই, যাঁর জন্যে বাবার মৃতদেহটার এত হেনস্ত, সেই ললিতাবাঈয়ের কাছে কেন যে পিতৃহারা ছেলেটা ছুটে গিয়েছিল সেই ভর সন্ধ্যেবেলায়, সেটা আজও রহস্য। সিঁড়ির মুখে গুরুজী, যার বাড়ি হয়ে আসছি, তাঁর সঙ্গে দেখা। সব শুনে বললেন—"ঠিক হ্যায় বেটা। হাম আতা" তারপর সমারোহের সঙ্গে বাবার সৎকার হল—এমন কি শ্রাদ্ধ পর্যন্ত। একটা কথা এই ফাঁকে বলি প্রমিতা, স্বচক্ষে দেখলাম, বাবার শ্রাদ্ধের দান আমার এই পরম আত্মীয়ের দল—জ্যাঠা, কাকারা গা-ঢাকা দিয়ে এসে নিয়ে গেলেন।

—নিয়ে গেল ?

—নেবে না ! এ' যে কাশী। মৃতদেহ ছোঁওয়ায় পাপ হয় কিন্তু কাঞ্চন ? সে যে ভোলানাথের মতই চিরপবিত্র।

সিন্ধিয়াঘাট ছেড়ে নৌকা চলছে দক্ষিণমুখে।

—পরীক্ষার কী হল ?

—সেটা আবার আর এক ঘটনা। শ্রাদ্ধ ত চুকল। কিন্তু পরীক্ষার ফী ? বাবার বৃত্তিটা বজায় রেখে টাকা জোগাড়ের জন্যে রান্না আর পড়ার মধ্যেই আবার একদিন ছুটলাম বাঈজীবাড়ি। দরজার গেটের

মুখে দেখা। সেই প্রথম। বেরুচ্ছিলেন। কি বলব, সে কি গহনার জৌলুস—পা থেকে মাথা অবধি মোড়া—আর শাড়িই বা কী! যাকে বলে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। দাঁড়িয়ে গেলেন। সেদিন মাথা ন্যাড়া, উরুণি গায়ে, খালি পা একটা ছেলের মধ্যে কি দেখেছিলেন, কাশীর বাঈজী সম্রাজ্ঞী ললিতা বাঈই জানেন। দেখার আর শেষ নেই। সরু রাস্তায় আশে-পাশে লোক, বুঝতেই পাচ্ছো আমার অবস্থা তখন—

—তারপর?

—হাত ধরে একেবারে তেতলায় শোবার ঘরে নিয়ে এলেন। আমার আসার কারণ শুনে চুপটি করে বসেই রইলেন। এদিকে লোকের পর লোক আসছে, তাগাদা দিচ্ছে, রাস্তায় জুড়ি দাঁড়িয়ে, কোথায় নাকি মুজরো করার কথা আছে, এমন কি বায়েনা পর্যন্ত নেওয়া—কিন্তু যাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ সে বসে রইল একই ভাবে।

নৌকা চলছে মণিকর্ণিকার ঘাট বরাবর।

—লোকের তাগাদা শেষ হতে ললিতাবাঈ উঠলেন। ফিরে এলেন অত্যন্ত সাধারণ বেশে। ফিয়ের টাকাটা আমায় দিয়ে বললেন—পুজো করতে এ বাড়িতে আর আসতে হবে না। গুরুজী তোমার সব খরচ দিয়ে আসবেন মাসে-মাসে। কিন্তু একটা কথা দাও আজিই? বললাম—কি কথা? বললেন—'তোমার ডাক্তার হতে হবে। হবে ত? কোথায় স্কুলফাইনাল আর কোথায় ডাক্তার হওয়া? হাঁ হয়ে থাকা দেখে আশ্বাস দিলেন—ভয় নেই, সে দায়িত্ব আমার। কিন্তু তুমি কথা দাও? বুঝতেই পারলাম না একটা নেহাৎই পথের ছেলের কথার কী দাম থাকতে পারে? কিন্তু দাম যে থাকতে পারে তখনই বুঝলাম প্রতিশ্রুতি পাবার পর ললিতাবাঈয়ের সেকি আনন্দ! অনেকদিন পর বুঝেছিলাম কেন তিনি সেদিন একটা ছেলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি এমন করে আদায় করে নিয়েছিলেন।

—কেন নিয়েছিলেন ? যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন প্রমিতা প্রশ্ন করল।

—দিল্লীর শহরতলীতে, খাড়া হয়ে বসলেন ডাক্তার। বললেন—এক বিধবা রেফিউজী মারা যান বিনা চিকিৎসায় পয়সার অভাবে। তার মেয়ের বাঈজীবৃত্তি নেবার অন্যতম কারণ—এমন একজন ডাক্তার তৈরী করা যাতে তার মার মতন অবস্থার স্ত্রী-লোকেরা অন্ততঃ একটু ওষুধ পায়। তাই ত সেদিন একটা ছেলেকে ডাক্তার হবার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিলেন অমন করে।

তারাভরা আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন আবার—প্রমিতা, তাঁর দেওয়া ফিয়ের টাকাটা নিয়ে সেদিন যখন রাস্তায় লোকের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম সত্যি বলতে কি, তখন তিনি আর আমার চোখে বাঈজী নন। ন' বছর বয়েসে যাকে হারিয়েছিলাম তাঁকেই আবার ফিরে পেলাম পনের বছর বয়সে। তারা ত কখন হারান না—চিরকালই থাকেন, যেমন রয়েছেন কেদার ঘাটের বাড়িতে, বাঈজী পাড়ায়।

মণিকর্ণিকার ঘাটের নিচের চাতালে মড়া পুড়ছে। চিতার আগুনে চারিদিক জ্বলজ্বল। কি বলতে গিয়ে নিমেষ-নিহত দৃষ্টি মেলে প্রমিতা শুধু চেয়ে রইল মাতৃবন্দনারত গৌরকান্তি এক পূজারীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে।

নৌকা আরো একটু এগুতে প্রমিতা বলল—মনে হচ্ছে বড়মার পরিচয় এইখানে শেষ নয়?

—শেষ? বেদনাতুর কণ্ঠে এবার বললেন ডাক্তার—নিজেকে একেবারে শেষ করার মধ্যেই বোধহয় সেই শেষ। শুধু কী আমার ডিসপেন্সারিটা আজও বড়মার খরচায় চলছে ? আরো কত কী ? প্রমিতা, তুমি যে স্কুলে কাজ করো—সেই স্কুল বাড়ির ভিতটা পাকা হয় আমার বড়মার টাকায়। ওই পোড়ো বাড়ি আর সেকেলে আসবাবপত্র ছাড়া মার আজ আর কিছুই নেই। এর ওপর গলায় ঝুলছে আইবুড়ো রুক্মিণীটা—ভূত-ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই যার।

—ওরে এইখানে দাঁড়া!

নৌকা ভিড়ল দশাশ্বমেধ ঘাটে।

—রুক্মিণীর পরিচয়টা? প্রমিতা হঠাৎ বড় বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বসল ডাক্তারের যাবার মুখে।

—পরিচয়? সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন—ধরে নিতে পার, আমারই মতন একজন—বড়মাকে ধরে পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করছে। আমি এইখানে নামলাম—কিছু ওষুধ কিনতে হবে। চেনা মাঝি—তোমায় ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। কোন ভয় নেই। চলি এবার!

সহজ উত্তরটা দিয়ে পুরোহিত-পুত্র সিঁড়িতে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে প্রশ্নকর্ত্রীকে যেন নিঃসীম শূন্যতা ঘিরে ধরল। মেঘ ঘনিয়ে এল তার ভ্রমর কালো চোখে। অশ্রু নদীর দু'কূল ছাপিয়ে উঠল নিজের ভুলটা নিজেই দেখে। বন্ধুত্বের ছাড়পত্রের মাধ্যমে যে-বাড়ির মণিকোঠায় তার আসন পাতা হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে—আজকে এই নক্ষত্র আলোতে স্পষ্ট দেখল—সে বাড়ির চৌকাঠও সে পেরুতে পারেনি। শুধু তাই নয়। দৈনন্দিনের ঘনিষ্ঠতায় যাকে ধরেই নিয়েছিল এক রকম হাতের ধরা—এই আত্ম-ধারণার স্বরূপটা আজই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করল, সেই হাতের ধরাটিকে ধরতে যাওয়া মানেই ঢেউ দিয়ে তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া। নৌকা আবার চলতে সুরু করল। জ্যোৎস্না ঢাকা রূপসী রজনী তখন হাসছে।

সুধাময়ী কিছুটা ভাল বর্তমানে। চলাফেরা করতে পারেন।

সেদিন তাঁর বিছানার চাদর বদলে প্রমিতা ওঠে দাঁড়িয়েছে—একেবারে মুখোমুখি ডাক্তারের সঙ্গে।

—ছোটমা, বিছানা বাঁধ! হাতে সময় বলতে নেই একদম! ডাক্তারের এই আচমকা ভূমিকাহীন প্রস্তাব সুধাময়ী—প্রমিতাকে থ করে তুলল।

—ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মা-মেয়ে দুজনেই যেন এই প্রথম মানুষের ভাষা শুনছো। তা শোনাচ্ছি আরো—আগে এ বাড়ির পাওনাটা পাই!

খাটে এসে বসলেন ডাক্তার। প্রমিতা আনন্দিকে চায়ের কথা বলে ফিরে আসতে ডাক্তার তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করলেন।

এই সময়টা প্রতি বছর মেডিক্যাল কনফারেন্স হয়। বিভিন্ন শহর এবং শহরতলী থেকে আসেন বিশেষজ্ঞেরা—কমপক্ষে অধিবেশন চলে সপ্তাহ-খানেক। এবারে অধিবেশন বসছে ধরমশালায়। তারই উল্লেখ করে ডাক্তার বললেন—পাহাড়ী জায়গা, জল হাওয়াটা ভালই। তোমার উপকারই হবে ছোটমা। আর প্রমিতা তোমার ত এখন স্কুল বন্ধ, কোন অসুবিধে নেই। এবার বুঝলে ত কেন বিছানা বাঁধতে বললাম?

—খুব ভাল হবে। ডাক্তারের এমন প্রস্তাবটা প্রমিতা যেন একরকম লুফে নিয়ে বলল—মা ত এক নাগারে এই গলিতে আট বছর পড়ে আছেন। তা যাওয়া হচ্ছে কবে?

—কবে নয়—কাল বাদ পরশু।

আনন্দির আনা শুকলালের সদ্য ভাজা জিলিপির সঙ্গে কাপ দুয়েক চা এক সঙ্গে শেষ করে মুখে পান পুরলেন ডাক্তার।

—বড়মা কেমন আছেন? ডাক্তারের ওঠবার মুখে প্রমিতা প্রশ্নটা করে বসল!

—আছেন এই পর্যন্ত, তবে পণ্ডিতজী সম্প্রতি মাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেছেন।

—আশ্রমে? এই অবস্থায়?

—আশ্রমই হয়ত এ অবস্থায় মার উপকার হবে।

কথাটা খটকা লাগল প্রমিতার। দেবমন্দির, দেবস্থান, আশ্রম এ জাতীয় জিনিষগুলো যে এই নাস্তিক চিকিৎসকের কাছে শুধু

অবিশ্বাস্য নয়—অবজ্ঞারও বটে। কাশীতে আসার দিন থেকেই তার প্রমাণ পেয়েছে কথায়-আচরণে বহুবার। একটু বিষোদ্গার করে বসল প্রমিতা ইচ্ছে করেই।

—কিন্তু আশ্রম-টাশ্রম ত তাঁর ছেলের কাছে উপহাসের জিনিস, তাই না?

—বিলক্ষণ।

—তবে?

—কী তবে?

—ডাক্তারছেলে রুগ্না মাকে পাঠালো যে বড়?

—কারণ! হাসিহাসি মুখে বললেন ডাক্তার—একজনের কাছে যা উপহাস অন্যের কাছে তাই আবার উপাদান—এ নিরেট সত্যটা ছেলে স্বীকার করে বলেই রুগ্না মাকে পাঠাতে সাহস করল।

বলা শক্ত কেন ডাক্তারের এই সহাস্য উত্তরটা প্রমিতাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। এক জ্যোতিষ্মান যেন অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করিয়ে দিলেন—এমনি যেন মনে হল প্রমিতার। তাই যদি হয় তাহলে এতবড় জ্যোতিষ্মানের কেন এত কারচুপি একজনকে রহস্যের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখার? যার কাছে এ বাড়ির সব কিছুই ব্যক্ত করেছেন, অথচ তার কাহিনী রেখেছেন অপ্রকাশ? প্রমিতা যেন মুল ধরে নাড়া দিল।

—রুক্মিণী, তার কি খবর?

—বাড়ি আগলাচ্ছে।

—আহা! বড় একা তাহলে?

বড়মার সম্বন্ধে প্রমিতার সব প্রশ্নে ডাক্তার বোধ হয় প্রীতিলাভ করেছিলেন, উত্তরও তাই দিয়েছিলেন সানন্দে। কিন্তু প্রমিতার এই শেষ প্রশ্নটি ঠিক যেন এক জনের একাকীত্বের প্রতি মমত্বশীল বলে ডাক্তারের কানে ঠেকল না।

মনে। বললেন এবার—তাতে লাভ নেই। পদ্ম দেবার চেষ্টায় কেউ হয়ত পাঁকই দিয়ে বসবে। গোটা বাঙালীটোলা ত দূরের কথা, আমারি কথা ধর না কেন—যা কিছু শোনা তা তোমারই মুখ থেকে। অথচ এই আট বছরের মধ্যে কালো তার মার কথা ভুলেও একদিন আমায় বলেনি। কেন বলেনি জান? যে ছেলে তার মাকে ষোল আনা দিতে পারে না, সেই ছেলে তার মার মহিমা ঢাকঢোল পিটিয়ে অপরের, ওই যে বললে—শ্রদ্ধা আদায় করে নিজের ঘাটতি পুরিয়ে নেয়। আমার কালো ত সেদিক থেকে রাজরাজেশ্বর। ওর একার দেওয়া শ্রদ্ধা মানেই গোটা বাঙালীটোলারই দেওয়া। হ্যাঁ, আর একটা কথা কালো, যতদিন না তোমার বড়মা ফিরে আসছেন, ততদিন রুক্মিণী মেয়েটিকে আমার কাছেই রাখ না কেন?

কে যেন ডাক্তারকে জোর করে বসিয়ে দিল। সুধাময়ীর শীর্ণ পায়ে হাত বুলালেন অনেকক্ষণ। বললেন এক সময় মাথা তুলে,

—তোমার এই কথাটা আমি কোন দিনও ভুলব না, ছোট মা। বেচারীর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম আর এক মায়ের আমন্ত্রণ পাওয়া। তবে তার দরকার হবে না। ক্যাম্বিসের মোটা ব্যাগটা বগলে চেপে এক রকম ছুটেই চলে গেলেন ডাক্তার। এমন বলিষ্ঠ লোকটির এভাবে বিদায়, যে কোন লোকের মনে হত যেন লোকটির পক্ষে নিজেকে ধরে রাখা এঘরে আর সম্ভব হচ্ছিল না।

কাশীতে আসা থেকে ডাক্তারের এ বাড়ি থেকে যাবার বেলায় প্রমিতা বরাবরই কিছুটা পথ সঙ্গে থেকেছে। আজই রইল দাঁড়িয়ে। একজন আমন্ত্রিত হওয়ায় আর একজনের এমন ভাববিহ্বল রূপটা প্রমিতার আশ্চর্য লাগল। রোজ দেখা লোকটির সঙ্গে আজকের এ রূপের কোন মিলই পেল না। ডাক্তারের ভাববিহ্বলতা দেখতে দেখতে প্রমিতার মধ্যেও যেন সংক্রামিত হল। খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল অনেকক্ষণ। কিন্তু দিনান্তে নিজেই নিজের ওপর এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল একটি কথার বারবার গুঞ্জন শুনে শুনে —'বেচারী'।

ধরমশালার যে বাড়িটি গোরা ডাক্তারকে দেওয়া হয়েছে—শহরের বাহিরে বটে, তবে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভরা। বাগানের মধ্যে পাইন আর রুদ্রাক্ষের গাছ ঘেরা এই লাল টালিছাওয়া বাড়িটা দূর থেকে দেখায় যেন থামের অন্তরালবর্তিনী লাল চেলী পরা একটি কনে-বৌ। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য—যে কোন দিক থেকেই চোখে পড়বে হিমালয়ের আকাশ ছোঁয়া বিরাট রূপ। ধ্যানস্থ যোগী বসে আছেন অন্তহীন কাল ধরে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে সুধাময়ী দেখেন অতি ক্ষুদ্র হয়ে যিনি আছেন তাঁর ঠাকুর ঘরে, কী বিরাট তিনি! তাঁর অন্ত নেই যে!

পড়ন্তবেলায় প্রমিতা পায়েপায়ে চলে এল বাগান পেরিয়ে রাস্তায়। ডাক্তার গেছেন তাঁর অধিবেশনে।

একটু আগে বৃষ্টি হয়েছিল ছমছমিয়ে। গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে এখনও। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছটা এসে পড়েছে হিমালয়ের চূড়ায়। নীড়মুখ পাখিদের কলকূজন আসছে হাওয়ায় ভেসে। জনবিরল এই গোধূলি বেলায় পা যেন এমনিতেই এগিয়ে চলে।

রাস্তাটা এখান থেকে চড়াই। অনভ্যস্ত প্রমিতা চড়াই পথটা পার হয়ে আসছিল মাথা নীচু করে। পাশ দিয়ে ফস করে চলে গেল এক সাইকেল আরোহী। প্রমিতা ওই পর্যন্ত লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু পর মুহূর্তে সাইকেল আরোহী পদব্রজে এসে প্রায় তার গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই, কঠিনভাবে এ বেয়াদপী শাসন করতে গিয়ে কলকণ্ঠে প্রমিতাই বলে উঠল—তুমি?

—কী মনে হয়? সাইকেলের মুখটা ঘুরিয়ে হাসল লোকটি।

—সত্যিই তুমি? সংসার বিবাগীর দেখা পাওয়া তাহলে যায়?

—যায় বৈকি? আমার বিরাগী হওয়া ত আর গুহায় প্রবেশ নয়। গাঢাকা দেওয়া পাওনাদারদের জ্বালায়। তা তুমি এখানে?

—আমার কথা সব শেষে। যেন লোকটির মুখ চেপে ধরল প্রমিতা, তোমার কথা আগে?

লোকটি চলতে চলতে বলল—চাকরি করি এখানে।

দাঁড়িয়ে পড়ল প্রমিতা। সামনের এই পাহাড়টায় এখনি যদি রূপান্তর ঘটত নদীতে, তাহলেও প্রমিতা চমকাত না এত?

—চাকরি? তুমি? এখানে?

—ফিকিরি বুদ্ধি নেই যে ব্যবসা করব, গেরুয়া পরিনি যে বাবাজী হব। গিলতে ত হবে?

প্রমিতা এবার লোকটিকে তন্ন তন্ন করে দেখল। লোকটি পড়েছে সস্তা খাকির ট্রাউজার হাফসার্ট। কাঁধে মামুলি ধরনের ঝোলা। পায়ে স্লিপার। বেশ কিছুদিন ধরে যে সেফটি রেজারের সঙ্গে লোকটির ছাড়াছড়ি চলছে এক নজরেই তা বোঝা যায়। কিন্তু যে সম্পদে এককালে সমবয়সীদের কাছে লোকটি ছিল অনন্য, সেই স্বাস্থ্যসম্পদ আজও অটুট।

—এখানে কী এমন চাকরি? প্রমিতার প্রশ্নটা পুরোপুরি অবিশ্বাসে ভরা।

—এখানকার দাতব্য হাসপাতালের রেজিস্টার-কাম কম্পাউণ্ডার-কাম কেয়ারটেকার। গড় গড় করে লোকটি যেন ফর্দ দাখল করল—মাইনে এখন অল ফাউণ্ড দুশো চল্লিশ। কোয়ার্টার ফ্রি, জল লাইট আলাদা চার্জ। আমার কথা ফুরাল, এবার—

—আমার কথা? সামনের চড়াই পিছনে রেখে প্রমিতা পা বাড়াল। বলল—এখানে মেডিক্যাল কনফারেন্স উপলক্ষে আসা। আসল উদ্দেশ্য জগৎটা একটু দেখা।

—দেখা হল? লোকটিও পায়ে পায়ে এগুলো।

—এই ত হল। বলেই অন্য কথা পাড়ল প্রমিতা—আশ্চর্য হচ্ছি, সেই অধঃপতন যখন হল, কলকাতা তখন কি দোষ করেছিল?

একচোট হেসে উঠল লোকটি—অধঃপতনটা কি?

—গোলামী?

কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই লোকটি বলল—কলকাতায় রাতে আমায় যে ভূতে পেত, সে ত নিজের চোখেই দেখছ অনেকবার।

—স্নাত ত এখানেও হয়? প্রমিতা কটাক্ষে লোকটিকে দেখে একটু যেন বিষোদ্গার করে বসল।

—হয়। রাস্তার সঙ্কীর্ণতার দরুণ লোকটিকে প্রমিতার গা ঘেঁষেই চলতে হচ্ছে। বলল—দুবেলা পেটে খেয়ে—তা আবার নিজের হাতে রেঁধে—যা থাকে তাতে মদের খরচ পোষায় না।

একজনের সরল স্বীকারোক্তির আঘাতে আর একজন যেন এই পাথুরে রাস্তার তলায় তলিয়ে গেল।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে কোমলকরুণ গলায় বলল প্রমিতা—নিজের হাতে রাঁধতে হয় তাহলে?

—দুশো চল্লিশ টাকা আয়ে বাবুর্চি রাখার বাবুয়ানি করতে হলে লোকের পকেট কাটতে হবে। লোকটি এবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

—দাঁড়ালে যে? বাগানের গেটটা খুলে প্রমিতা এক পাশে সরে দাঁড়াল।

বিভিন্ন রংয়ের কাচঘেরা বারান্দায় উঠে এল দুজনে।

অন্ধকার জমে উঠেছে। ক্ষান্ত বর্ষণটা আবার শুরু হবার সূচনা। পশ্চিম কোণে বিদ্যুৎ হানছে থেকে থেকে।

—বোস! পাশের বেতের চেয়ারটা দেখাল প্রমিতা। দেয়ালের গায়ে সাইকেলটা রেখে বসল লোকটি। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না অথচ কারুরই হুঁস হল না হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপতে।

—ভদ্রলোকটিকে দেখছি না? কার সম্বন্ধে এ' প্রশ্ন প্রমিতার ধরতে দেরী হল না। প্রশ্নের খাতিরে বলল—থাকলে দেখতে পেতে।

—বেরিয়েছেন বুঝি?

জলকে ঘুলিয়ে তোলবার একটা কৌতূহল জাগল প্রমিতার। কিন্তু লোকটির মুখের সারল্যের কাছে নতি স্বীকার করতে হল—হ্যাঁ, গেছেন মেডিক্যাল কনফারেন্সে।

—আচ্ছা! লোকটির কণ্ঠস্বরে আহ্লাদের আভাষ—তাহলে ডাক্তার!

প্রমিতা যে এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে তা বুঝল লোকটি এই অন্ধকারেও। বলল—তা তুমি গেলে না যে?

—আমি কি বুঝব? অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল প্রমিতা এক সময়।

—ধন্যবাদ। সবজান্তা-শাড়ি পরে সর্বত্র স্বামী অনুগামিনী যে হও না এই যথেষ্ট। তা ফিরবেন কখন?

—রাত হবে।

বিদ্যুৎ চমকালো। চকিত আলোয় প্রমিতাকে দেখে নিয়ে লোকটি চেয়ারটা টেনে বলল—কবে হল?

কথাটা প্রমিতার কানে যায়নি ভেবে পুনরুক্তি করতে গিয়ে লোকটি প্রচণ্ড ধমক খেল প্রমিতার কাছে।

—কী কবে হল?

—তাও কী বলতে হবে? ধমক খেয়েও লোকটি হাসছে।

বৃষ্টি নেমেছে সপ-সপিয়ে। প্রমিতা উঠে জানালাটা বন্ধ করে লোকটি ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তিক্ত গলায় বলে উঠল—বাপ-মা হারা একটা মেয়েকে সতাতো ভাইদের বাড়িতে ফেলে রেখে যে পালিয়ে যায়, তার আবার এত কৌতূহল কেন—কবে কী হল?

—তারই বা কৌতূহল কেন—লোকটিও ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল—কে নিজের হাতে রেঁধে খাচ্ছে, না সাতপাকেবাঁধা রাঁধুনির রান্না খাচ্ছে জানতে?

প্রশ্নের তাৎপর্য যে লোকটি ধরে ফেলেছে তা দেখেও কিন্তু প্রমিতা দমলো না। সরোষে বলল—তার কারণ, একজনের কাছ থেকে ভীরুর মতন পালিয়ে কার আবার আঁচলের তলায় ঢুকে পৌরুষ দেখাচ্ছে, জানতে হবে বৈকি?

লোকটি এবার চুপসে গেল। মাথা নীচু করে কি ভেবে এক সময় বলল—স্বীকার করি পালিয়ে যাওয়া। তবে সেটা ভীরুর মতন নয়।

প্রমিতার এক ঝলক হাসিতে কাচের ঘরটা যেন ঝলমলিয়ে উঠল।

বলল—তা বটে। ভীরুর মতন পালানো নয়, বীরের মতন পশ্চাদাপসরণ। তাই না বৈরাগী?

হাসিটা গায়ে মেখেই লোকটি বিনয়ের সঙ্গে বলল—ঠিক তাও নয়।

—তবে কারণটা কী?

—আত্মগত।

—আত্মগত? শ্লেষের সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রমিতা—না আত্মগোপন?

—তাই হয়ত! অন্ধকারে যতদূর সম্ভব প্রমিতার চোখে চোখ রেখে বলল লোকটি—কাঙালপনাকে মারতে হলে ওই রকম কিছু একটার দরকার হয়েছিল তখন।

লোকটির কষ্টে জ্বালা বাতিটাকে প্রমিতা যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল—ওটা কাপুরুষতা। দুর্বলের আত্ম-সমর্থন।

আবার লোকটিকে মাথা নিচু করতে হল। পরে বলল—কিন্তু নীতির দিক—

প্রমিতার হাসিতে কাচের ঘরটা যেন ঝনঝনিয়ে উঠল! বলল রসিয়ে রসিয়ে—সন্ধ্যেরাতে যাদের ভূতে পায়, তারাও তাহলে নীতির নামাবলি পরে? হাম্বাগ!

—তারাই পরে। কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে ধীর গলায় লোকটি বলল—তাদের সব সময় একটা অপরাধী অপরাধী ভাব থাকে বলেই ছাপ মারা অনেক ভদ্রলোকের মতন বেপরোয়া ভাবে নীতির গলা টিপে ধরে না। অবশ্য আমার চলে আসাটা এভাবে আমি সমর্থন করছি না।

—তবে?

—বললাম ত, যোগ্যতার অভাবেই আমায় গাঢাকা দিতে হয়েছিল। আর হয়েছিল বলেই না আজ এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মেডিক্যাল কনফারেন্সের মাননীয় সদস্যের স্ত্রী হতে পেরেছ। সত্যি বলতে কি প্রমিতা, আজ আমাকে তোমার মিষ্টিমুখ করানো উচিত।

গড়গড় করে এত কথা বলে লোকটি যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। পকেট থেকে বিড়ি বার করে দেশলাই জ্বালল। লোকটির মুখে নিজের নামটা উচ্চারণ হওয়ায় প্রমিতার ভিতরটায় তীব্র আন্দোলন শুরু হল সেই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেই বর্ষণনিবিড় অন্ধকারের দিকে। এদিকে পরম নিশ্চিন্তে লোকটি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছে থেকে থেকে। লোকটির এই ধূমপান আয়েস, আচম্বিতে প্রমিতার রক্তে যেন আগুন জ্বালিয়ে তুলল। দুহাত দিয়ে কানের দুপাশের চুলগুলো তুলে ধরে বলল প্রমিতা—তাহলে জেনে রাখ শঙ্কর, মিষ্টির বদলে তোমার বরাতে আছে নিমপাতা।

চেয়ারের সঙ্গে শঙ্কর যেন চেপটে গেল। ভয়ার্ত গলায় বলল এক সময়—কারণ?

—কারণ, যাঁর সঙ্গে এখানে এসেছি এবং যিনি গেছেন অধিবেশনে অর্থাৎ তোমার মাননীয় সদস্য, তিনি আমার স্বামী নন।

অন্ধকার ঘরে তাকে ধরে রেখে এসব কি আরম্ভ করেছে প্রমিতা! হাতের বিড়ি হাতেই ধরা রইল শঙ্করের। সকাতর মিনতি জানাল—আলোটা?

দমকা হাসিতে ঘরটা ভরিয়ে তুলে বলল প্রমিতা—অন্ধকারের মতই আমায় মনে হচ্ছে না? ঘুরে দাঁড়িয়ে সুইচটা টিপল।

জগৎহারা এই অন্ধকারের মধ্যে একখানি কাচের ঘরে এই মাত্র যে রহস্যময়ী প্রত্যক্ষ হল, দগ্ধবিস্ময়ে শঙ্কর শুধু চেয়ে রইল তার প্রতি। এই কি সত্যিই সেই কান্তিময়ী, যার ক্ষুদ্রতম কথা, সমান্যতম সঙ্গ পাবার জন্যে সর্বেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে থাকত কালীঘাটের বাড়িতে আট বছর আগে রাত্রি দিন?

—কী দেখছ? ভেঙ্গে পড়া খোঁপাটা হাত ফের দিয়ে শঙ্করের চেয়ারের হাতলে বসে বলল প্রমিতা—সিঁথিতে সিঁদুর, অথচ এসেছি পরপুরুষের সঙ্গে পাহাড়ি জায়গায়, ঘর বেঁধেছি শহরতলীতে—একটা বেড়াল ঠিক বুকের মাঝখানটায় আঁচড়াচ্ছে ত?

—কাপুরুষের কি কৌতূহল সাজে?

শঙ্কর যেন প্রমিতার পায়ের মাটি টেনে নিল। ঝুঁকে পড়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল প্রমিতা অনেকক্ষণ। বিড়ির শেষ অংশটা টানছে তখনও শঙ্কর তুচোখ বুঁজে।

—কথাটা যখন উঠেছে—নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বলল প্রমিতা —তখন শোন, বর্তমানে প্রমিতার স্বামী বলতে কেউ নেই। যিনি ছিলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার—এখন ভূতপূর্ব। তিনি বর্তমানে তাঁর জার্মান পত্নিসহ কোম্পানির দেওয়া রেনী পার্কের প্রাসাদে অবস্থান করছেন—যাকে বলে বিপুল গৌরবে। তবে সিঁথিতে এটা কেন? মেয়েদের হাড় জ্বালানি সহানুভূতি আর পুরুষদের কামাতুর দৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাব বলে। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে একটা আরামনিঃশ্বাস ছাড়ল প্রমিতা। বাহিরের হাওয়ার দাপটে জানলাগুলো কেঁপে উঠছে। বিষ্টিটা চেপে এলো আরো। হতবাক শঙ্করের পক্ষে শক্ত হল কাকে সে তার অনুভূতির মধ্যে ধারণ করবে—বাইরের বর্ষণমন্দ্রিত ওই পাগলিনী নিশীথিনীকে, না পাশে বসা এই রহস্যময়ীকে। পকেটে হাত ঢোকাল আর একটা বিড়ির সন্ধানে।

—তুমি বোস। শঙ্করের হতভম্ব অবস্থাটা চোখ বুলিয়ে বলল প্রমিতা—পাশের ঘরে আমার শাশুড়ি আছেন—একবার দেখে আসি!

শাশুড়ি? মানে—

—মানে আমার প্রাক্তন পতির মা। আশ্চর্য ঠেকছে? ঠেকবারই কথা। দেখেছে, মার মন্ত্রণায় অনেক ছেলে বৌ ত্যাগ করেছে কিন্তু দেখনি বোধ হয়, ছেলের ত্যাগ করা বৌকে শাশুড়ি বুকে তুলে নিয়েছে? আশ্চর্য ত ঠেকবেই! এলাম বলে। শঙ্করের মাথাভরা চুলে হাতটা বুলিয়ে এক রকম ছুটেই চলে গেল প্রমিতা। শঙ্কর এসে দাঁড়াল জানলার কাছে। অন্ধ বিভাবরী। প্রাণস্পন্দনের চিহ্ন নেই এতটুকু কোথাও। শুধু একটানা বিষ্টির আর পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের তীব্র শব্দ।

প্রমিতা এল, বিস্কুট আপেল কিছু বাদাম আর কফির ট্রে নিয়ে।

—শুধু কথা আর কথা। ট্রে-টা টেবিলে রেখে বলল প্রমিতা—নাও আরম্ভ কর! কফির দরকার হলে আরো দেব।

কালীঘাটের বাড়িতে গোল্লায় যাওয়ার অপরাধে দাদার অনাদর আর বৌদির গঞ্জনার মধ্যে যার গোপন সমবেদনা রৌদ্ররুক্ষ পথে ছায়ানিবিড় একটি আশ্রয় ছিল—যদিবা সেই নিজের জীবনের বিপর্যয় ব্যাখ্যা করে নির্লিপ্ত গলায় "তিনি বর্তমানে তাঁর জার্মান পত্নিসহ অবস্থান করছেন বিপুল গৌরবে" ঐ শোনার পরে আর কি কফি ঢালা যায় গলায়? আনলেই বা নিজের হাতে? হলই বা এমন বর্ষণরাত?

—প্রমিতা

—দোহাই শঙ্কর! আর্তনাদ করে উঠল প্রমিতা। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল চামচেটা। কুড়িয়ে এনে সেটা তিক্ত গলায় প্রমিতা বলল—করুণা জানাতে এস না!

—ভয় নেই। শঙ্কর দু'হাতে প্রমিতাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল—সে অসম্মান তোমার হবে না। আমি শুধু ঘটনাটা জানতে চাই?

—কী লাভ?

—লাভ? একটা ছেলের মত্ত অবস্থায় বাড়ি আসার অপরাধে আহার বন্ধের শাস্তি দেওয়া দেখে, সেই বাড়ির ভাড়াটে মেয়েটা যে লাভে উপোস করে থাকত—সেই লাভে।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় বাড়িতে আসার দরুণ দাদা বিশেষত বৌদির কটুক্তিতে ও অনেক রাতই কাটাতে হত শঙ্করকে বাড়ির রোয়াকে, শুয়ে সেই রাতে নিজের খাবার ইচ্ছাটা যে আর থাকত না এতদিন পরেও মনে পড়ল প্রমিতার। কথাচ্ছলে একদিন ত বলেই ফেলেছিল শঙ্করকে, আর শুনতে হয়েছিল—আমার জন্যে উপোষ করে কী লাভ তোমার? আজ সেই লাভের প্রশ্ন শঙ্করের মধ্যে দেখা দেওয়ায় প্রমিতার রুদ্র চাহনিটা স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ একই ভাবে শঙ্করকে দেখে বলল—কিন্তু কফি যে জল হয়ে গেল?

—থাক ওটা।

—কষ্ট হচ্ছে ? কিন্তু আমি যে নিজের হাতে করেছি ?

শঙ্কর কফির-পেয়ালাটা টেনে নিল, ততক্ষণ প্রমিতা বলতে শুরু করেছে—কলকাতার ফার্ম তাঁকে পাঠায় জার্মানিতে স্পেশাল ষ্টীল উৎপাদন প্রণালীটা শেখবার দরুন। ভারতে তখন সেই লোহার চাহিদা দারুণ, অথচ উৎপাদন প্রণালীটা অজানা। ইম্‌পোর্টের অবস্থা তথৈবচ—ফরিন একসচেঞ্জের নিদারুণ অভাব। শিক্ষা চলতে লাগল হাতে-কলমে। কিন্তু দিন না যেতেই বুঝতে পারলেন—শুধু হাতেই ফিরতে হবে। কারণ, বিশেষ লোহা তৈরীর বিশেষত্বটাই জার্মান কোম্পানীর ট্রামকার্ড বিজনেস টার্ম্‌সে যাকে বলে ট্রেড সিক্রেট। ধনলক্ষ্মীকে কেউ কি পরদেশীর হাতে তুলে দেয় ? কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সেই কোম্পানীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে ডিনারের পর, নাচের আসরে যে মেয়েটির সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্য লাভ করলেন, তিনি আর কেউ নন কোম্পানীর মালিকের একমাত্র দুহিতা। আদা-জল খেয়ে লেগে গেলেন সেই রাতের নৃত্য-সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করতে। যদি সেই বিশেষ লোহা উৎপাদন প্রণালীটা লাভ করা যায় মালিক কন্যার করুণাকৃপায়। আগেই বলছি ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আদা-জল খাওয়া সার্থক হল।

—হল ?

—না হবার ত কারণ নেই। যা যা থাকলে তোমাদের সুপুরুষ বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়—তা দিতে তার বিধাতা কোন কার্পণ্য করেননি। এর ওপর রয়েছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ শ্রম-ক্ষমতা, মার্জিত মন আর বুদ্ধি ? তার ত পরিচয় আগেই পেলে। কি চুপ করে গেলে যে ? অদ্ভুত ঠেকছে না ? শঙ্কর, বিজ্ঞান শুধু যন্ত্রের গতি বাড়ায়নি, মানুষের মনেরও। যা ছিল সহস্রবৎসরের সাধনার ধন তাকেও অনতিবিলম্বে পাওয়া যায় আজকের দিনে। কাপে চুমুক দিল প্রমিতা।

—তারপর ?

—তারপর ? তারপরই ত দৃশ্যান্তর। তখন যে-সাধনা শুরু হল, তার জন্যে কোন ফার্ম কোন মেটারলজিস্টকে পাঠায়নি কোন বিদেশিনীর

পদপ্রান্তে এ যাবৎ। দেখতে দেখতে হিয়া হিয়ে মিলল, টুটিল পাশ। বাহিরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে প্রমিতা আবার বলল—কিন্তু পরিচয় মুহূর্তে যে কথা উচ্চারিত হল না—জার্মানির মাটি ছাড়ার দিনেও তা অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

—কথাটা কী, প্রমিতা? বড় ভয়ে ভয়ে যেন জানতে চাইল শঙ্কর।

—কথা নয় শঙ্কর, অঙ্গচ্ছেদ। "আমি যে ব্যাংক্রাপ্ট। এক বৈশাখীমাসের গোধূলি লগ্নে এক বঙ্গ ললনার আঁচলে বাঁধা হয়ে আছি ইতিপূর্বেই"—এ' সত্যটা প্রকাশ না হয়ে বরঞ্চ প্রকাশ্যে সেই বঙ্গ ললনাই হত্যা হয়ে গেল নীল নয়নার ললিত লীলার যূপকাষ্ঠে। হেসে উঠল প্রমিতা।

—বল কী?

—উপায় কী। তৎপর বলল প্রমিতা—সত্যটা অপ্রকাশ ছিল বলেই না উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল সেদিন বিদেশী মাটিতে। বাকি কফিটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে কাপটা সরিয়ে রাখল প্রমিতা। গলা অবধি ঠেলে ওঠা একটা তিক্ততাকে যেন গরম এই পানীয়টা দিয়ে দাবিয়ে রাখল।

কিছুটা সময় নিঃশব্দে যাবার পর বিমূঢ় শঙ্করের মুখ দিয়ে একটা কথাই বের হল—আশ্চর্য!

—মোটেই নয়। প্রমিতা যেন এমন কিছু শোনার জন্যেই বসে ছিল। বলল—স্বীকার কর তো, আমাদের মনটা অনেকগুলো তারে বাঁধা। তার মধ্যে একটা হল কৃতজ্ঞতা। দুহাত ভরে ওঠবার পরই সে তারে যখন অজান্তে ঝঙ্কার ওঠে, তখন সুরের মাতালটা এমনি করেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়। অত চমকাবার কিছু নেই। ওই অবস্থায় তুমিও তাই করতে গো!

—সন্দেহ কী। শঙ্কর আর একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল—শেষটা?

আস্তে আস্তে কানে কানে বলল প্রমিতা—শেষটা ত তোমার কাছেই বসে।

—এ ত শেষের শেষ। মাঝখানে?

—শঙ্কর, সোজা হয়ে বসে প্রমিতা বলল—ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পর কচ দেবযানীতে কৃতজ্ঞতার নামে বুড় আঙ্গুলটা দেখিয়ে সড়ে পড়েছিল। কিন্তু মানুষ ত কচের মত অন্তঃসারশূন্য নয়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের বদান্যতায় মর্ত্যের কচকে আট মাসের মধ্যে ফিরে এসে যে মুগ্ধ দুইখানি হিয়া নিখিলবিস্মৃত—তা যুক্ত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতে হল দেবযানীকে।

—কিন্তু কোন ভরসায়? শঙ্করই এবার রুখে উঠল—স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও?

প্রমিতা যেন এবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। কি ভেবে বলল—এ প্রশ্নের কোন উত্তর আজও বের হয়নি। যুক্তি হিসেবে হয়ত বলা যায়—যে বিদ্যে সকলের ভাগ্যে জোটে না, তাই পাবার উল্লাসে আর জন্মভূমির চাহিদা মেটাবার সম্ভাব্যের আনন্দে, মানুষ বোধ হয় এমনিভাবেই মনের ভারসাম্য হারিয়ে বসে। অবশ্য তুমি যেন ধরে নিও না আমি নিখিলেশকে ডিফেণ্ড করছি?

—মানলাম। এরপর?

—এরপর বড় করুণ, শঙ্কর।

হাওয়ার দাপটে জানালাটা খুলে গেল। জলের ঝাপটা এসে লাগছে গায়ে। প্রমিতার কোন হুঁসই নেই। শঙ্কর উঠে জানালাটা বন্ধ করে কি বলতে গিয়েই চুপ করে গেল।

নীরবতা প্রমিতাই ভাঙ্গল এক সময়—ওঃ, সে কী নিদারুণ ট্রাজেডি! মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক। একদিকে অফিসে দ্রুততর পদোন্নতি, বন্ধু মহলে প্রতিপত্তি, রাজ সরকারের প্রশংসা-পত্র, অন্যদিকে লোকটার ততই শারীরিক অবনতি আর আমার যমযন্ত্রণা বৃদ্ধি। শঙ্কর, সুস্থ করে তুলতে তাঁকে, সেই আট মাস কিছু বাদ রাখিনি। শুনলে হাসবে, তাগা মাদুলী কবচ ধারণ করে মন্দিরে ধর্ণা, মসজিদে সিন্নি পর্যন্ত দিয়েছিলুম। কিন্তু তখন কি জানতাম রোগটা এদেশের মাটিতে—

জানালার বাইরে চেয়ে রইল প্রমিতা। নিঃসীম অন্ধকার। থেকে থেকে হাওয়ার আন্দোলন আর বিষ্টির একটানা গোঁঙানি।

হাতে ধরা বিড়িটা অনেকক্ষণ নিভে গেছে—কিন্তু দেশলাই জ্বালাবার সামর্থ্যটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছে শঙ্কর।

—একদিন প্রাতঃরাশের সময়—প্রমিতাই কথা বলল—ফোন এল দমদম এয়ারপোর্ট থেকে। ফোন পেয়েই বেরিয়ে গেলেন। মাঝ রাতে যে মানুষ এসে দাঁড়াল, আর সকালে যে বেরিয়েছিল, দুয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, সত্যি বলতে কি শঙ্কর, তা দেখে তখনিই কেন জানি না একটাই আক্ষেপ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—এ' দেখার পরও আমি বেঁচে আছি কেন? কিন্তু আশ্চর্য। আক্ষেপটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া শুরু হল। যেটা ভেতরে, ভেতরে রক্ত চুষে খাচ্ছিল এই আট মাস, তাকে আর ভেতরে রাখতে পারলেন না! আর পারবেন কী করে? তখন যে—

—তখন যে?

—তখন যে সশরীরে উপস্থিত কলকাতায় আট মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে এলো বলে।

—বল কী?

প্রমিতা খলখলিয়ে হেসে উঠল শঙ্করের বলার ধরন দেখে ঠিক তোমারই মতন আঁতকে উঠেছিল নিখিলেশ, যখন তাকে বলেছিলাম—কাল সকালেই জানিয়ে দিয়ে আসতে তাকে, মেয়াদ শেষ হলেও প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতি।

—কিন্তু আমাদের সংবিধানে শুনেছি—

—ঠিকই শুনছ। সেই রাতেই আইনজীবীর পরামর্শ মত রাইট উয়িদড্রয়্যালের রিটিন ডিক্লারেশন নিখিলেশের হাতে তুলে দিলাম। বলতে ভুলে গেছি, দলিলে সইটা হল ব্যাকডেটেড। সেইটা নিখিলেশের কাছে আইনের মুক্তি আর স্ত্রীর কাছে প্রতারক না হবার ডকিউমেণ্টারী এভিডেন্স।

—ব্যাকডেটেড এটা ত বুঝলাম না?

—বুঝবে কী করে? ওষুধ আর রুগী, রুগী আর ওষুধ করে করে বুদ্ধি কি আর আছে? ব্যাকডেটটাই প্রমাণ করবে, ঘরে বৌ পুষে

নিখিলেশ অন্য মেয়ের গা চাটেনি। যে বৌ ছিল, জার্মানি যাবার আগেই সে নিখিলেশের কাছে ভূতপূর্বা। অবশ্য কোর্ট ফরর্মালিটি হিসেবে নিখিলেশকে .ডিগ্রি নিতে হয়েছিল আমার নামে স্বৈরচারিতার অপরাধে কেস ঠুকে।

—ডিগ্রি পেল ?

—না পাবার কারণ ত নেই। অপরাধিনীর কোর্টে গরহাজিরটাই ডিগ্রি পাবার সহজ রাস্তা। ব্যস্, ঘটনার এইখানেই শেষ।

শঙ্কর উঠে প্রমিতার দুই কাঁধে হাত রাখাল। স্বেচ্ছায় সব অধিকার ত্যাগ করে যে মেয়েটা চলে এলো তার পুরস্কার কী শুধুই শূন্যতা ?

—কে বললে ? হাসল প্রমিতা। অত বড় পুরস্কার—ব্যাভিচারিণীর অপবাদ ?

কেঁপে উঠল শঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটো প্রমিতার কাঁধ থেকে যেন খসে পড়ল।

প্রমিতাই এবার শঙ্করের শিথিল হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল পেয়েছি—এমন কিছু পেয়েছি যা অনেক অনেক মেয়ের ভাগ্যে জোটে না।

—কী তা ?

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন বিদেশিনীকে ক্লেদাক্ত মন নিয়ে ফিরে যেতে দিইনি। চেয়ে আছে শঙ্কর নিমেষনিহত দৃষ্টিতে। যে মেয়েকে দেখছে এখন কখনও যেন দেখেনি তাকে। প্রমিতার গর্বদীপ্ত মুখের অভিব্যক্তি যেন শঙ্করের মধ্যে ক্রমশ সংক্রামিত হল। প্রমিতার উষ্ণ হাত দুটি ধরতেই তার মধ্যে রক্তের আন্দোলন শুরু হল সেই মুহূর্তে। গরবিনীকে বুকের একান্তে এনে মুখ নিচু করে দিতে যাবে—বাইরে শব্দ উঠল ঠিক তখনই। বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণে বাজ পড়ল। পর মুহূর্তে প্রমিতা ছুটে বেরিয়ে গেল।

প্রমিতা ফিরে আসতেই শঙ্কর বলল—আসি তা হলে ?

—এই বৃষ্টিতে ?

—ওতে কিছু হবে না। চলি! ঝোলাটা কাঁধে নিল শঙ্কর।

—জানি, কিছুতেই কিছুই হয় না তোমার। শঙ্করের দিক থেকে সরে এল প্রমিতা। বলল—বর্তমানের প্রমিতার কিছু না জেনেই চলে যাবে?

সাইকেলটা নিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শঙ্কর। একবার বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল—কিছু না জেনেই ত একদিন কালীঘাটের বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলাম, আজ আবার—

— কেন গিয়েছিলে? মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রমিতা।

—আগেই ত কারণ বলেছি।

ওটা কারণ নয়। অক্ষমের আত্মপ্রসাদ। রৌদ্রে ঝলসে ওঠা তরবারির ঝিলিক প্রমিতার ঠোঁটে।

শঙ্কর দাঁড়াল এসে প্রমিতার মুখোমুখি। বলল — একটা বিদেশিনীকে ভারত সম্বন্ধে ক্লেদাক্ত মন নিয়ে ফিরে যেতে না দেওয়াটাই যদি অনেক কিছু পাওয়া হয়, একটা অনাঘ্রাতাকে ছেড়ে আসা, সঙ্গ দোষে উচ্ছন্নে যাওয়া একটা ছেলের পক্ষে কী অনেক কিছু পাওয়া নয় প্রমিতা?

—তাই বলে এই? জলে টলটলিয়ে ওঠা চোখে বলল প্রমিতা —সারা জীবন নিজের পিণ্ডি নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া?

—তার মানে? একটু যেন হাসল শঙ্কর—তুমি বলতে চাও, এতদিনে যা হোক একটাকে ঘরে এনে তাকে দিয়ে আমার পিণ্ডিটা রাঁধান উচিত ছিল?

ফোঁটায় ফোঁটায় জল নেমে এল প্রমিতার গাল বেয়ে। টেবিলটা ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। শঙ্কর প্রমিতার পিছনে দাঁড়িয়ে তার দুই কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল আবার—ভুলি কী করে, তোমার বাবার অসুখের সময় যখনই কিছু করেছি, যখনই কিছু কিনে নিয়ে গেছি, তখনই তোমার চোখে যে ভাষা পড়েছি তার পরেও আর কী আমার পক্ষে সম্ভব প্রমিতা, অপর মেয়ের হাতে হাত রেখে বিয়ের মন্ত্র পড়া?

প্রমিতা ঘুরে দাঁড়াল। শঙ্করের রুক্ষ চুলের গন্ধ পাচ্ছে। তার জামার স্পর্শ লেগেছে শাড়িতে। আস্তে আস্তে হাত দুটো রাখল শঙ্করের কাঁধে। বাহিরে একটানা ছেদহীন জলের শব্দ। থেকে থেকে জানলাগুলো নড়ে উঠছে হাওয়ার দাপটে।

—এস! এক সময় বলল প্রমিতা কি ভেবে—মার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।

প্রমিতা পা বাড়িয়েছে শঙ্কর কি যেন একটা ইঙ্গিত করল।

—ভাগ্যি! আলতো হেসে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে প্রমিতা বলল—এস!

বই পড়ছিলেন সুধাময়ী খাটে বসে। প্রমিতা বলল—আমার মা।

শঙ্কর সুধাময়ীকে প্রণাম করল।

—এঁর পরিচয়? চোখ থেকে চশমাটা খুললেন সুধাময়ী।

—আমরা কালীঘাটে এদের বাড়িতে ভাড়া ছিলাম। আমার বাবাকে নিজের বাবার মতন শ্রদ্ধা করত! অসুখে কত কি যে করেছে—নাম শঙ্কর।

—চেহারার সঙ্গে নামটির বেশ মিল হয়েছে। হাসলেন সুধাময়ী।

—শুধু চেহারায় নয় মা—নামের সার্থকতা বজায়ও রেখেছে।

—কী রকম?

—ঘর বিবাগী। এক রকম পথে পথেই—

—সংসার ধর্ম—

সুধাময়ীর মুখের কথা লুফে নিয়ে প্রমিতা উৎসাহের সঙ্গে বলল—কৈ আর করল। মা মারা যাবার পরই পৈতৃক বাড়ির অংশ, ব্যাঙ্কের টাকা, দাদা বৌদির হাতে তুলে দিয়ে গাছতলা সম্বল করেছিল এক কাপড়ে। দেখছেন না মা, গেরুয়ার বদলে খাকি পড়েছে—আধুনিক শঙ্কর কিনা!

হেসে উঠলেন সুধাময়ী। সুধাময়ীর আড়ালে প্রমিতাও মুখে আঁচল চাপা দিল।

—এখানে তাহলে? সুধাময়ী শঙ্করকে বসতে আহ্বান করলেন।

নিজের ইতিবৃত্ত বলবার সুযোগ শঙ্করকে না দিয়েই প্রমিতা আগেভাগে বলে বসল—এখানকার দাতব্য হাসপাতালে কাজ করে যে।

—রুগীর সেবা! উৎফুল্ল গলায় বললেন সুধাময়ী—আমার কালোর গোত্র! আহা, বড় ভাল কাজ। ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন। বৌমা, শঙ্করকে চা দাও?

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। এতক্ষণে শঙ্কর কথা বলল—আমি কফি খেয়েছি। তা আর আছেন ক'দিন?

—তা বোধ হয় আরো দিন চারেক। এর মধ্যে আবার এস শঙ্কর?

—আসব মা, নিশ্চয় আসব। তা আজ চলি?

—যাবে? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন সুধাময়ী—এখনও যে জল পড়ছে?

—চলে যাব এক রকম। উঠে পড়ল শঙ্কর।

—যদি অসুবিধে না হয়, আজ রাতের মতন এইখানে—

—আপনি চিন্তা করবেন না মা। শঙ্কর পা বাড়াল।

—মা যখন বলছেন তখন—বাইরেটা দেখে নিয়ে প্রমিতা বলল—তা ছাড়া না গেলে কেউ ত-আর ভাবতে বসবে না।

—আমি ত তাই বলি—এই জন্যে তোমায় ছাড়ি কী করে বল?

—না মা, আমায় যেতেই হবে। ঝোলাটা হাতে নিল শঙ্কর।

—বাড়িতে কেউ বুঝি আছেন?

—আছে। আমার একটা হরিণ, দুটো সারস আছে মা। আমায় না দেখতে পেলে বেচারীরা সারা রাত ছটফট করবে। চলি মা!

বারান্দায় এসে শঙ্কর সাইকেলে হাত রেখেছে, পিছন থেকে শুনল—চলে যাবার এটাই কারণ না অজুহাত?

—বুঝতেই পারেনি শঙ্কর কখন প্রমিতা এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। সাইকেলের আলোটা ধরাতে মাথা নিচু করল। হয়ত বা ভাবতে সময় নিল। বলল মাথা তুলে—মার কাছে প্রথমটা, দ্বিতীয়টা তোমার কাছে।

—কারণ? একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল প্রমিতা।

—দেখতে পাচ্ছো না, আজকের রাতটা কি সাংঘাতিক—তার ওপর—

—আমি? তাহলে ভয়ে পালাচ্ছো?

—কালীঘাটের বাড়িতে আট বছর আগে, দরজার কাছাকাছি এসে বলল শঙ্কর—যে আলোটা অন্ধকার সরিয়ে দিত, আজ সেই আবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—কতক্ষণ পারবে এই পোকাটা নিজেকে ধরে রাখতে?

প্রমিতা আর কিছু বলার সুযোগই পেল না। ততক্ষণ শঙ্কর সাইকেলে চেপে অন্ধকারে মিশে গেছে। এক সময় প্রমিতার হুঁস হল জলের ঝাপটায় তার শাড়ি ব্লাউজ সপসপিয়ে উঠেছে।

এ ক'দিন শঙ্কর ঠিকমত এসেছে কাজ ফেরত। গোরা ডাক্তারের সময়াভাব হেতু শঙ্করই প্রমিতাকে দেখিয়েছে এখানকার দ্রষ্টব্য যা কিছু। শুধু তাই নয়, সুধাময়ীকেও একদিন শঙ্কর এনেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে সন্ধ্যারতির সময়। সুধাময়ীর অনুরোধে একরাত্রি আহার করতে হয়েছিল শঙ্করকে এ বাড়িতে গোরা ডাক্তারের সঙ্গে। মোট কথা শঙ্কর এখন সুধাময়ীর সংসারে একজন।

আজ সকালের বাসে ফিরে যাওয়া। সুধাময়ীকে নিয়ে শঙ্কর এল বাস স্ট্যাণ্ডে। প্রমিতা, ডাক্তার আগেই এসে গেছে। এমন সময় হন্তদন্ত ভাবে এলেন ডাক্তার মিশ্র, আবাল্য বন্ধু গোরা ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। তিনি নাকি এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সর্বময় কর্তা।

—আরে শঙ্কর যে? ডাক্তার মিশ্র থ হয়ে রইলেন।

—তোমার চেনা নাকি? প্রশ্ন করলেন গোরা ডাক্তার।

—বিলক্ষণ। আমার হাসপাতালেই ত শঙ্কর কাজ করে। গর্বদীপ্ত গলায় আবার বললেন ডাক্তার মিশ্র—শঙ্করই ত আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। আমি আর সময় পাব কোথায় রুগী দেখবার? যা করে সবই শঙ্কর। পায়ে পায়ে প্রমিতা এসে দাঁড়াল দুই ডাক্তারের পিছনে।

—জানো ব্যানার্জী। সিগারে টান দিয়ে বললেন ডাক্তার মিশ্র—সিনসিয়ারিটি থাকলে মানুষ যে কি করতে পারে—তার দৃষ্টান্ত শঙ্কর। এই ত মাত্র ক'বছর, এরই মধ্যে—ও, তোমাদের ত সময় হল—গুড লাক।

ডাক্তার মিশ্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সুধাময়ীকে নিয়ে উঠে এলেন বাসে গোরা ডাক্তার।

প্রমিতা শঙ্করের একান্তে এসে নিচু গলায় বলল—ভাবছি ডাক্তার মিশ্রকে ধরে সার্টিফিকেটটা লিখিয়ে নেব।

—কী হবে তাতে? হেসে ফেলল শঙ্কর।

বাঁধিয়ে সেটা শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখব।

—কী লাভ?

—ওইটুকুই লাভ।

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছে শঙ্কর আর তখনই রক্তে যেন আন্দোলন শুরু হল। ডাঃ মিশ্রের কতকগুলো শুকনো কথাই তাহলে দাঁড়াবে স্বামী পরিত্যক্তা প্রাক্তন প্রেমিকার শেষ সম্বল? ভেতরে পুষে রাখা আট বছরের এক জৈবিক কামনা জানাবার অত্যুগ্র আবেগে শঙ্কর তখনই জানাতে চাইলো প্রমিতাকে—কিন্তু বাস ওদিকে স্টার্ট দিয়েছে।

চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুধাময়ী বললেন—কলকাতার দিকে এলে একবার কাশীতে এস, শঙ্কর?

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে মা। পায়ে পায়ে শঙ্কর এগুল কিছুটা।

একটা বাঁক নিয়ে ড্রাইভার এবার স্পীড দিল। সিলেণ্ডার পাইপ থেকে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

মাস তিনেক হয়ে গেছে সুধাময়ী ফিরেছেন কাশীতে। পৌঁছানোর সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখতে হয়েছিল প্রমিতাকে শঙ্করের নামে, যদিও তার অজানা ছিল না, যার উদ্দেশ্যে লেখা তার ঘুমের কোন ব্যাঘাতই ঘটবে না, এ কুশল সংবাদ না পাওয়ায়। তবুও প্রমিতাকে কলম ধরতে হয়েছিল নিছক শাশুড়ির অনুরোধে। কিন্তু সে দিনটা প্রমিতার কেটেছিল এক অনাস্বাদিত বিস্ময়ে, যেদিন তার চিঠি পাওয়ার আনন্দ ইঙ্গিতটা এসেছিল স্বজনহীন পর্বতবাসীর কাছ থেকে অচিরাৎ।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের অনুরোধে সম্প্রতি গোরা ডাক্তারকে নিতে হয়েছে সরকারী হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অর্থে এবং সম্মানে ডাক্তারের দক্ষতারই উপযুক্ত।

স্কুল ফেরত প্রমিতা সেদিন পেল চিঠি। হাতের লেখাটা দেখেই দাঁড়িয়ে রইল একই ভাবে। ভুলে গেল শাড়ি ছাড়ার কথা, ভুলে গেল সুধাময়ীর কাছে যাওয়া। হাতের মুঠোয় চিঠিটা ধরা রইল। এদিকে আনন্দির আনা চা খাবার ঠাণ্ডা হতে লাগল।

খামটা ছিঁড়ল এক সময় কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে। বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। পড়া শেষে প্রমিতা সায়াহ্নের ধূসর আকাশের দিকে চোখ ফেরাল।

আর একবার চিঠিটা পড়তেই প্রমিতা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল সদ্যজাত শিশুর কলকণ্ঠ। দেখতে পেল এক আগন্তুকের শুভ পদার্পণে এতদিন শিশু বর্জিত রেণী পার্কে এক নূতন প্রাণস্পন্দন।

"নিষেধ অমান্য করার জন্য"—লিখেছে নিখিলেশ—"আমায় ক্ষমা কোরো—কারণ আমি নিরুপায়। গত রবিবার এ বাড়িতে যার আবির্ভাব ঘটল—তার আবির্ভাব সংবাদ তার পিতামহীকে জ্ঞাত না করার অপরাধে ধর্মতঃ পিতাকে অপরাধী হতে হবে পুত্রের কাছে ভবিষ্যতে।" চিঠিটার শেষ ছত্র—"এখন নাতির ভাগ্য ঠাকুরমার আশীর্বাদ পাওয়া না পাওয়া।"

সুধাময়ী নাতির শুভাগমনের কল্যাণে যা করণীয় সবই করলেন ঘরে বসে প্রমিতার হাত দিয়ে। নবজাত শিশুর দীর্ঘ আয়ু এবং নিরোগ স্বাস্থ্য কামনায় পূজা পাঠালেন মন্দিরে মন্দিরে। মিষ্টান্ন আর কাঞ্চন পাঠালেন ব্রাহ্মণদের। বলা বাহুল্য প্রথম আশীর্বাদক হলেন গোরা ডাক্তার। সব শেষে একটি লিপিসহ ছোট একটি সোনার হার পাঠালেন সুধাময়ী রেণী পার্কের ঠিকানায়—ঠাকুরমা—নাতির স্বর্গীয় বন্ধনের অক্ষয় চিহ্ন স্বরূপ।

বাঙালীটোলা পোস্ট অফিসে সুধাময়ীর দেওয়া আশীর্বাদ-উপহার রেজিস্টারী করে প্রমিতা রাস্তায় পা দিয়েছে, চোর ধরার মতন বন্দী হয়ে গেল গোরা ডাক্তারের হাতে। তার স্নান আহার উঠল শিকেয়। সূর্য তখন মাথার উপর দপ দপ করছে।

—তোমাকেই খুঁজে মরছি। মোটা কোটের হাতাটা দিয়ে কপালটা মুছলেন ডাক্তার।

—কী অপরাধ করলাম?

—যথেষ্ট। নইলে তোমাকেই বা নিয়ে যাব কেন! এখন পা চালিয়ে চল?

—কোথায়? প্রমিতাকে প্রায় ছুটতে হল ডাক্তারের সঙ্গে তাল রাখতে!

—বললাম ত! দেবনাথপুরা ছড়ে—ডাক্তার খেদোক্তি করলেন—মা হয়ে এই কাজ করলি হতভাগি! এখন অপগণ্ডোগুলো দাঁড়ায় কোথায়?

—এই ভরা দুপুরে কার গুণ-কীর্তন হচ্ছে?

—তোমাদের দয়াময়ের সংসারে যারা সুখের পালা গাইতে আসে! হতচ্ছাড়ি!

—তা ত বেশ বুঝলাম। আর একটা গলিতে ডাক্তারের সঙ্গে এসে প্রমিতা বলল—কিন্তু হতচ্ছাড়িটা কে?

—আবার কে? তোমাদের শৈল। এবার নারাণঘাট গলিতে প্রবেশ করলেন ডাক্তার।

—কিন্তু করেছে কী?

—কিছু না করবার থাকলে বাঙালী মেয়েরা যা করে—গলায় দেয় দড়ি।

—আরে হল কী?

এক রকম দাঁড়িয়ে পড়ল প্রমিতা। কানে এসেছিল—শৈলর স্বামী নিরুদ্দেশ আজ নিয়ে মাস চারেক। বাড়ির রোয়াকের ওপর সেই থেকে শৈল দোকান দিয়েছিল মুড়ি-তেলেভাজার। সত্যি-মিথ্যে বিশ্বনাথই জানেন, তবে শৈলর' সম্বন্ধে এ সুখ্যাতি বাঙালীটোলার মেয়েদের মুখে মুখে—সে নাকি বছর বিউনী।

বাড়িটার সামনে বেশ ভিড়। পুরুষের চাইতে মেয়েই বেশী। সমালোচনা আর নানা মন্তব্যে জায়গাটা গম গম করছে। ডাক্তারকে দেখে সবাই একদিকে সরে এসে পথ করে দিল।

—তোমায় এনেছি, থমকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার বললেন—লাশের তদ্বির করতে নয়, শৈলর ছেলেমেয়েদের ভার নিতে। বোধ হয় এখনও পর্যন্ত সবগুলো উপোসী রয়েছে।—ওরে ফটিক, তুই একবার থানায় খবরটা দিয়ে আয়?

ডাক্তার গেলেন কলতলার দিকে—যেখানে এখন শৈল ঝুলছে। প্রমিতা এল পাশের ঘরে।

বাড়িতে এত লোক দেখে বাচ্চাগুলো হতবাক। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে ভাইবোনেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। চৌকাঠে পা রাখতেই প্রমিতা দেখল কতকগুলি মূর্তিমান ক্ষুধা মেঝেতে বসে। সব শেষেরটি মাটিতে পড়েই ঘুমোচ্ছে। বুঝতে দেরী হল না প্রমিতার, এ ঘুম নয় প্রচণ্ড দুর্বলতায় নেতিয়ে থাকা। হাত বাড়িয়ে তাকেই আগে তুলতে গিয়ে প্রমিতার নজর পড়ল নিজের মুঠায়। কি এটা? রূপার চামচ মুখে নিয়ে যে সন্তান এসেছে পৃথিবীতে, তাকেই সোনার হার পাঠানোর রেজিস্টারী রসিদ। সেটা দেখা মাত্র প্রমিতা যেন ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে কানে বেজে উঠল ডাক্তারের খেদোক্তি—"তোমাদের দয়াময়ের সংসারে যারা সুখের পালা গাইতে আসে।" দয়াময়ই বটে! প্রমিতা যেন চাক্ষুষ দেখল একদিকে নিঃস্বতার মুখব্যাদান অন্যদিকে ঐশ্বর্যের আস্ফালন।

এ অন্তহীন পালার যিনি পালাকার তাকে বলে আসছি 'দয়াময়'। জানালা গলিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে ঘুমন্ত কঙ্কালকে বুকে তুলে নিল প্রমিতা। এরপর শৈলর সংসারের ঘটি-বাটি এ বাড়ির ওপর তলার ভাড়াটেদের জিম্মায় দিয়ে বাকি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সটান রাস্তায় এসে একটা সাইকেল রিক্শায় চেপে বসল। একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে প্রমিতা স্বগতোক্তি করল—'ডাক্তার করুক বাকি যা করবার।'

আজ স্কুল শেষে সোনারপুরার রাস্তায় পা রেখে অভ্যাসবশতঃ দ্রুত চলতে গিয়েই প্রমিতা দাঁড়িয়ে পড়ল খাড়া। গত পনের দিন শেষ পিরিয়ডটা কোন রকমে শেষ করেই তাকে ছুটতে হয়েছিল বাড়িতে। কোন কারণে দেরী হওয়ায় বাড়তি খরচ পর্যন্ত তাকে করতে হয়েছে রিক্শায় আসার দরুন। সেটা শ্রম লাঘবের হেতু নয়—সময় বাঁচানোর একান্ত প্রয়োজনে। নইলে সময়মত বাচ্চাদের মুখে যে দুধ-মিষ্টি পড়বে না। আহা তারা যে তারই মুখ চেয়ে আছে! যদিও লোকচোখে এটা আতিশয্য বই আর কিছু নয়—যে সংসারে সুধাময়ী বর্তমান, সেখানে শৈলর বাচ্চাগুলি কী অনাহারে থাকবে? এ আশঙ্কা শুধু ভিত্তিহীন নয়, সুধাময়ীর কর্তব্যবোধের পরে সন্দেহ আরোপ। কিন্তু জগতের যত হাতই এগিয়ে আসুক না কেন স্নেহ-দাক্ষিণ্যের উপাচার নিয়ে নিজের হাতে নিরাশ্রয়দের না খাইয়ে দিলে প্রমিতার সেদিন যে নিজের আহার-রুচি বিষিয়ে উঠত। নিজের চোখেই সে দেখেছে কার নীড়ে প্রত্যাগমন আশায় শাবকদের আকুল অধীরতা শৈলর প্রতিভূদের চোখে। পড়ন্ত বেলায় তাই ত প্রমিতাকে ছুটতে হয়েছিল এ পনেরোটা দিনে ঊর্ধ্বশ্বাসে। রোদ ত আজও পড়ে এসেছে কিন্তু আজ যেন জগতের সমস্ত জড়তা প্রমিতার দু পায়ে।

লোকের গা বাঁচিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে বাঁধান বটতলায় এসে দাঁড়াল। জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন নিরিবিলি। সামনেই বাড়ির পথ। সারাদিনের শ্রমকাতরতা বিনোদনের আরাম আশ্রয়। এক শয্যা-শায়িনীর মামুলি অভ্যর্থনা আর এক পরিচারিকার হাতের তৈরী ক্ষুধা

নিবৃত্তির উপাদান। তারপরই নিরেট নিস্তব্ধতা। প্রহর যাপনের ক্লান্তিকর গ্লানি পরদিন স্কুল না যাওয়া অবধি। বৈচিত্র্যহীন জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস ধরে রাখার এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। গত পনেরোটা দিনের অসহায়দের পরিচর্যা করার মধ্যে যে ক্লান্তিহীন উন্মাদনা তাকে এক অনাস্বাদিত আনন্দলোকে নিয়ে এসেছিল—প্রমিতার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল —এ লোকে তার অবস্থান চিরকালের। কিন্তু সে-কালের যবনিকা যে আজ সকালেই ঘটবে আশান্বিতার সে ধারণাই ছিল। তখন সত্যিই বুঝতে পারল প্রমিতা, যখন অসহায় ভাবে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে হল নৈহাটির মামা—শৈলর দাদা সব কটি ভাগ্নে-ভাগ্নিকে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসি মুখে রিক্‌শায় উঠে স্টেশন পথে যাত্রা করলেন বাড়িটাকে একরকম খালি করে দিয়ে।

বাড়ির গলিটা ছেড়ে প্রমিতা এবার পা বাড়াল গঙ্গার দিকে। ওই ত লাল বাড়িটার তলায় গোরা ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারি। রুগীও ত রয়েছে বসে। আছেন নিশ্চয়ই নিজের কাজ নিয়ে। প্রমিতা এক ছুটে যেন গা ঢাকা দিয়ে চলে এল। শুধু তাই নয়, লোক জড় করে একটা কথা চিৎকার করে বলবার তীব্র উত্তেজনা হঠাৎ জাগল তার রক্তে— 'তোমরা সব পাবে এই লোকটির কাছে। পাবে ওষুধ, অর্থ, বল, ভরসা এমন কী বন্ধুত্ব। কিন্তু বিনিময়ে তুমি কিছু দিতে চাইলে ঠকবে, আঘাত পাবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।' সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে আবার বলতে চাইল প্রমিতা —'জেনে রাখ তোমরা, তোমাদের আদর্শ পুরুষটি তুই মাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে চলেছেন নিজের কক্ষপথ—তাহল ভয়ঙ্কর রকমের মহৎ হবার সাধনায় কিন্তু কারুর সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য নয়। এই জনারণ্যের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আচম্বিতে আজই স্পষ্ট অনুভব করল প্রমিতা, ডাক্তারের বন্ধুত্বের মধ্যে মর্যাদা আছে কিন্তু প্রাণ নেই।

হনহনিয়ে চলে এসে বাঁদিকের রাস্তা ধরল এবার। তুপা এগুলেই গঙ্গা। এখান থেকেই ত দেখা যাচ্ছে কেদার মন্দিরের চূড়া। চার দেওয়াল ঘেরা নিভৃত চত্বরে এই ত সেদিনের কথা, কার্যোদ্ধারের প্রয়োজনে যে এসে দাঁড়িয়েছিল তারই কাছে করজোড়ে—প্রমিতা চাক্ষুষ

দেখল, সেই ত এখন প্রমত্ত উল্লাসে মত্ত নিজের সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু এ আনন্দ থাকত কোথায়—যদি সেদিন ফিরতে হত শূন্য হাতে? গলা অবধি ঠেলে ওঠা একটা অসহনীয় জ্বালা যেন প্রমিতাকে গঙ্গার কূলে টেনে নিয়ে এল।

জায়গাটা আঘাটা। লোক বলতে নেই কোথাও। শ্যাওলা ধরা ভাঙ্গা পাথরের টুকরো আশে পাশে। প্রদোষের ছায়া ঘনিয়ে উঠছে।

কোন রকমে নেবে এসে একটা নড়বড়ে পাথরে বসে হাঁপ ছাড়ল প্রমিতা। গঙ্গার হাওয়ায় একটু যেন সুস্থ হল এতক্ষণে।

উত্তেজনা প্রশমিত হতে কোন এক সময় নিজের জীবন পরিধি পরিক্রমা করল প্রমিতা অক্ষুব্ধ শান্ত চিত্তে। এই আঘাটার বিরাট শূন্যতার মতই, দেখল, নিরেট নিশ্ছিদ্র শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে শুধু। উদ্দেশ্যহীন পড়ে থাকা এই পাথরগুলোর মতই সামঞ্জস্যহীন এক ভারবাহী জীবন—সামনে দিগন্তজোড়া ব্যাসকাশীর মতই সুদূরপ্রসারী। দপ করে মনে এল তার অধুনাকালের এক বিস্ময়কর সাক্ষাৎ। আকর্ষণীয়ও সেটা কিন্তু ততোধিক অভাবনীয়, আট বছরের বিচ্ছেদের পরে দৈবাৎ মিলনের চিরইতি ঘটে গেল দুপক্ষের স্মিত হাসির মধ্যে দিয়ে চিরকালের মতন। না হল কোন প্রতিশ্রুতির বিনিময়—না হল কিছু দেওয়া-নেওয়ার দান-প্রতিদান।

ছায়াচ্ছন্ন এই জনহীন অন্ধকারে প্রমিতা আচমকা যেন নড়ে উঠল। সব কিছু ছাপিয়ে প্রত্যক্ষ করল একটি সদ্যজাত শিশুর অনাবিল হাসি। হলই বা কঙ্কালসার। এই পনেরটা দিনেই ত দেখা দিয়েছিল জীবনশ্রী, ওষ্ঠ ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, দেহ ত বৃদ্ধির দিকে—তবে—

একটা কঠিন শক্ত কিছুকে ধরবার জন্যে শূন্যে হাত বাড়াল প্রমিতা। সায়াহ্নের অন্ধকার আস্তে আস্তে ঘনীভূত হতে লাগল তার চোখের সামনে।

সেবার শীতের শেষে লেপ-কম্বল রৌদ্রে দিয়ে পরবর্তী মরশুমের জন্যে তুলে রাখার সময়, শীতের পুনরাগমন ঘটল অকস্মাৎ মার মার মূর্তিতে। কেবল একাই এল না—ছু দোসর সঙ্গে এবার—ঝড় আর জল। বিধাতার রুদ্ররোষের দাপটে তখন, সারা উত্তর প্রদেশের হৃদকম্প উঠল।

ছু'দিনের পর আজ বৃষ্টির বেগটা সামান্য কম। কিন্তু ঝড়ের অত্যাচার একই রকম। সন্ধ্যার দিকে সুধাময়ীর ঘরে কাঠের আগুন জ্বলে। গমের ডালাটা নিয়ে প্রমিতা বসল খড়-মাটি বাছতে। পাশের ঘর থেকে হালুয়ার গন্ধ আসছে। ঠাণ্ডা লাগায় সুধাময়ীর আজ রাতের মতন হালুয়া পথ্য।

—ছোট মা?

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে মুহূর্তে বাড়িটা গমগমিয়ে উঠল। ডালাটা রেখে সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দিল প্রমিতা।

—এই ছুর্যোগ মাথায় করে কি আসতে হয়? বৌমা বুঝি ডেকে পাঠিয়েছে।

—কাজের চাপে এ ক'দিন আসতে পারিনি সত্যি, সুধাময়ীর কথার উপরেই বললেন ডাক্তার—তাই বলে ডেকে পাঠালে আসব—এ অপবাদ দিও না ছোট মা, ধর্মে সইবে না।

—কিন্তু এই ছুর্যোগে—

সুধাময়ীকে এবারও থামতে হল। ডাক্তার বললেন—ছুর্যোগেই তোমাদের কোলটা বেশী করে মনে পড়ে। কিন্তু এদিকে যে জমে গেলাম!

গা থেকে বর্ষাতিটা খুলতেই প্রমিতা হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল সেটা।

খাটে এসে ডাক্তার বসতেই সুধাময়ী নিজের হাতে কম্বলটা মেলে দিলেন তাঁর গায়ে।

—ওতে হবে না ছোট মা: যতক্ষণ না এ বাড়ির পাওনাটা—

—হাজিরটা কম পড়লে, রান্না ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে উত্তরটা দিল প্রমিতা, পাওনাটা খারিজ হয়।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এল চা আর সুধাময়ীর জন্যে হালুয়ার কিছুটা অংশ।

—আজ এই দিয়েই পাওনাটা মেটাতে হবে। ট্রে-টা সামনে ধরে দিল প্রমিতা।

—তোফা। খানিকটা হালুয়া মুখে পুরে বললেন ডাক্তার—গর-হাজির হওয়ায় এই যদি শাস্তি হয়, বলতেই হবে আমার শাস্তির বরাত ভালই।

চায়ের সঙ্গে চলতে লাগল নানান আলোচনা। বর্তমানের এই প্রাকৃতিক উৎপীড়ন তার মধ্যে অন্যতম।

ঘণ্টাখানেক কাটার পর বর্ষাতিটা নিয়ে উঠে দাড়ালেন ডাক্তার সুধাময়ীকে কিছু চিকিৎসা নির্দেশ দিয়ে। প্রমিতা জ্বেলে দিল আলোটা।

দুপা গিয়েই ফিরলেন ডাক্তার। বললেন—ও, বলতেই ভুলে গেছি, তোমার মনে আছে ছোট মা, ধরমশালার ডাক্তার মিশ্রকে?

—না মনে থাকবার কি হল? হাসলেন সুধাময়ী।

—কলকাতায় যাবার পথে নেমেছিল কাশীতে। তারই কাছে শুনলাম, আমাদের সেই ছেলেটি গো—কী নাম—

—তুমি শঙ্করের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ শঙ্কর!

—কী হয়েছে তার? সোজা হয়ে বসলেন সুধাময়ী। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ফিরে এল প্রমিতা।

—শুনলাম—বললেন ডাক্তার—খাদ থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক রকমের নাকি চোট পেয়েছে। এখন নাকি—

—কী রকম সাংঘাতিক? কম্বলটা গা থেকে ফেলে দিয়ে উৎকীর্ণ হলেন সুধাময়ী।

খাটের বাজুটা ধরে প্রমিতা দাঁড়াল এসে ঠিক ডাক্তারের মুখোমুখি।

তবে কী কলকাতার ভূতটা আবার ভর করল? আট বছরের মধ্যে কই এমন ত ঘটল না?—আশ্চর্য কী! আট বছরে যে ঘা-টা শুকিয়ে এসেছিল আস্তে আস্তে, তাকে ত সেই খুঁচিয়ে দিয়ে এল এই সেদিন। ঘায়ের জ্বালায় নির্বাসিত প্রাণটা যদি আবার ভূতগ্রস্ত হয়, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া ত অনিবার্য রাস্তা-খাদের পার্থক্য বিলুপ্তির মধ্যে। একবার ইচ্ছা হল প্রমিতার, বন্ধ জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের ওই জল-ঝড়ের মত্ততার সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে।

—ঠিক কী রকম ডাক্তার মিশ্র বলতে পারলে না।

—বল কী? শুনেছি ওই ত ওখানকার হাসপাতালের মাথা। তা হলে—

—মিশ্রর শোনা ত লোকের মুখে—তাই সঠিক বলতে পারল না।

—কারণ?

—ও যখন কলকাতায় আসবে বলে স্ট্যাণ্ডে আসে তখন খবরটা পায়।

সুধাময়ীর সব প্রশ্ন যেন শেষ হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে।

ভাবছি—নীরবতা ভঙ্গ করলেন ডাক্তার—একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম করব ধরমশালার হাসপাতালে।

—আর কিছু? সুধাময়ীর কণ্ঠস্বরটা কেমন অস্বাভাবিক ঠেকল ডাক্তারের কানে। বললেন তিনি—যোগাযোগ করার আর ত কোন রাস্তা নেই। ক'দিন ধরেই ত টেলিফোন লাইন আউট অব অর্ডার। খবরটা পেলেই জানাব। এবার উঠি!—হ্যাঁ, একটা মিকশ্চার পাঠিয়ে দিচ্ছি, আজ রাতেই এক দাগ খেও কিন্তু—চলি।

—কালো?

—ছোট মা? ফিরলেন ডাক্তার।

—তোমার বা আমার আত্মীয়ের মধ্যে কারুর যদি এমন হত, আমরা কী শুধু টেলিগ্রাম পাঠিয়েই দায় সারতে পারতাম?

সুধাময়ীর কণ্ঠস্বর আগেই ডাক্তারকে বিচলিত করেছিল, তাই এ

প্রসঙ্গের ইতি করতে চেয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গেই। এখন বাধ্য হয়েই খাটে আবার বসলেন—আমায় কী করতে বল, ছোট মা?

—খুব যদি অসুবিধে না হয়, একটু থেমে থেকে বললেন সুধাময়ী, —তোমারই একবার যাওয়া দরকার। জানই ত, শঙ্করের আপন বলতে কেউ নেই।

কিছুক্ষণ মৌন থাকতে হল ডাক্তারকে। মাথা তুলে বললেন এক সময়—অসুবিধে যে নেই এমন নয়, তবে তোমার যখন ইচ্ছে—তাই হবে ছোট মা। কাল সকালের ট্রেনটাই ধরব।

—বৌমা?

প্রমিতা সামনে আসতেই বললেন সুধাময়ী—শুনলে ত, কাল সকালেই ট্রেন। তোমার জন্যে কালো যেন আবার ট্রেন ফেল না করে?

কথাটা বোধগম্য না হওয়ায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই সুধাময়ী বুঝিয়ে দিলেন—যা নেবার আজ রাতের মধ্যেই গুছিয়ে নাও মা, কাল সকালে ত আবার সময় পাবে না। কালোর সঙ্গে তোমাকেও যে যেতে হবে?

প্রমিতা কি বিদ্যুৎস্পর্শ পেল! নইলে ঘরভরা গুরুজনদের সামনে কেঁপে ওঠে! অসাড় হয়ে আসা সর্বেন্দ্রিয়কে এক করে আপ্রাণ চেষ্টায় শুধু বলতে পারল—কিন্তু আপনি যে অসুস্থ মা?

—হ্যাঁ, বুকের অবস্থাও ভাল নয়, সর্দি জমেছে—এ ক্ষেত্রে—

ডাক্তারের কথা শেষ না হতেই সুধাময়ী বললেন—তুমি, বৌমা দুজনে চলে গেলেও তোমার হাতের তৈরী মিকশ্চার ত রইল। ডাক্তারের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে এবার স্বগর্বে বললেন সুধাময়ী —তোমার ওষুধ যে আমার কাছে বিশ্বনাথের চরণামৃত। শেষ সময় যদি আসে, অমৃত ত হাতের কাছে রইল। আর তোমাকে বলি বৌমা, এ সময় তুমি যদি শঙ্করের পাশে গিয়ে না দাঁড়াও, আমার মৃত্যু যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না। এবার সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দাও?

ডাক্তারের এঁটো কাপ-ডিসটা যেন প্রমিতাকে বাঁচাল এ ক্ষেত্রে।

ধোওয়ার অছিলায় এক রকম ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে সেগুলো নিয়ে।

অন্ধকারে একা কোন রকমে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন ডাক্তার। শাশুড়ির আবেদন সত্ত্বেও প্রমিতা পারল না সে রাতে ডাক্তারের সামনে এসে আলোটা জ্বালতে।

সকালের দিকে প্রমিতা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ডাক্তার এলেন। ট্রেনের সময় অল্পই তখন। তাই হাঁকডাকে বাড়িটাকে যেন মাতিয়ে তুললেন। সুধাময়ীকে আর এক দফা পরীক্ষা করে আনন্দিকে সব বুঝিয়ে দিলেন। এবার যাত্রা করলেই হয়।

প্রমিতা সুধাময়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বললেন তিনি, —বিশ্বনাথ করুন তোমরা গিয়ে যেন শঙ্করকে ভালই দেখ।

—সেই আশীর্বাদই করো—এস প্রমিতা! ডাক্তার পা বাড়িয়েছেন সুধাময়ী বললেন—তবে একটা কথা কালো?

—চটপট বল! হাত ঘড়িটা দেখলেন ডাক্তার।

—শঙ্করকে আনবার মতন অবস্থা যেদিন হবে সে দিনই নিয়ে আসবে?

—নিয়ে আসব? কোথায়?

—এইখানে, এই বাড়িতে।

ডাক্তার একবার প্রমিতার মুখের ওপর চোখটা বুলিয়ে নিয়ে সুধাময়ীর আদেশের অর্থকে পরিষ্কার করতে চাইলেন—ও, তুমি বলতে চাইছো, শঙ্কর এখানে কিছুদিন এসে থাকুক! হ্যাঁ, তা মন্দ বলনি ছোট মা, বিশ্রামও হবে, শরীরটাও সুস্থ হবে।

—কিছু দিনের জন্যে নয় কালো, বরাবরের জন্যে।

ডাক্তার দেখলেন রোগশীর্ণার মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের এক অভাবনীয় দৃঢ়তা। রোগীর প্রলাপ বা কোন খেয়ালের বশীভূতবশতঃ অর্থশূন্য প্রস্তাব তা ত নয়। এদিকে চোখ ফেরালেন ডাক্তার, দেখলেন প্রমিতা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে। যেন এক পাথরের নারীমূর্তির বিশাল চোখে অনন্ত বিস্ময়।

—বরাবরের জন্য যদি থাকতে হয় ছোট মা, যেন এক অবাস্তব সিদ্ধান্তের মারাত্মক ভুলটা তুলে ধরতে চাইলেন ডাক্তার—তা হলে শঙ্করের ধরম্‌শালার চাকরির কী হবে—ভেবে দেখেছো কী ?

—দেখেছি বৈকি, ছেড়ে দেবে।

—চাকরি ছেড়ে দেবে ? এইবার যে সন্দেহের ইঙ্গিত বিদ্যুৎ চমকানোর মতই রেখাপাত করল ডাক্তারের মনে, তা হ'ল সুধাময়ীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে। ডাক্তারী দৃষ্টি মেলে নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ সুধাময়ীকে। কিন্তু কোন অসামঞ্জস্যতা পেলেন না চিকিৎসক মুখের কথার সঙ্গে চোখের চাহনির। এ দিকে সময় বলতে আর নেই ট্রেন ধরবার। ডাক্তার এবার যেন তার যুক্তিতর্কের পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করেন—বলছো ত চাকরি ছেড়ে দেবে—কিন্তু তারপর ? একটু ভেবে-চিন্তে কথাটা বলো, ছোট মা ! যাক্—এস প্রমিতা ?

—কালো ? একটু যেন শ্লেষের সঙ্গে বললেন সুধাময়ী বুক থেকে কম্বলটা সরিয়ে—শুনেছি, সরকারি হাসপাতালে তুমি নাকি মস্ত বড় ডাক্তার, এরই মধ্যে বেশ নাম করেছ, তোমার দক্ষতার কাছে সরকার পর্যন্ত মুগ্ধ। তাই যদি হয়, তাহলে আট বছরের কম্পাউণ্ডারি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি স্বজনহীন সহায়শূন্য বাঙালী ছেলের মাত্র কম্পাউণ্ডারি চাকরি করে দিতে পার না তুমি, তোমার এই সরকারী হাসপাতালে ? তা যদি না পার, আমি বলি কী কালো, তাহলে গোলামী করা ছেড়ে দাও ? হ্যাঁ, আর কি বলছিলে যেন—চাকরি ছেড়ে দিলে তারপর ? কালোর মা যাকে কাছে টানে তার জীবনে তারপর বলে কিছু থাকে না। বালিশে মাথা রাখলেন সুধাময়ী।

যে বস্তুর মহিমায়, মনে পড়ল ডাক্তারের, মাথা নেড়া, খালি পা, উরুনি গায়ে, এক পথের ছেলেকে দেখ—এক যুবতী তার রাণীত্ব ত্যাগ করে ভিখারিণীর বেশে পথে আঁচল বিছিয়ে বসতেও দ্বিধা করেনি—সেই বস্তু যদি এই মৃত্যু পথযাত্রিণীর বুকে হাহাকার তোলে—সুদূর বিদেশে পড়ে থাকা স্নেহ-প্রেম, বর্জিত আঘাতপ্রাপ্ত একটি প্রাণীকে একাত্ম করবার—বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক স্পষ্টই, আজ নিজেই নিজের

কাছে স্বীকার করলেন কোন অধিকারই নেই তার, চাকরি—ভবিষ্যত প্রভৃতি অবান্তর প্রশ্ন তুলে এ অমোঘ মিলনের অন্তরায় সৃষ্টি করা।

—তাই হবে ছোট মা। অভিভূত ডাক্তার খুব আস্তে আস্তে বললেন—যেদিন আনবার মত অবস্থা হবে, সেদিন শঙ্করকে তোমার কাছে নিয়ে আসব। তাহলে এবার আমরা—

একটু তাড়াতাড়ি কোরো কালো। সুধাস্নিগ্ধ গলায় বললেন সুধাময়ী—বুঝতে পারছি, আর সময় বেশী নেই। এবার বিশ্বনাথ সত্যি আমায় কৃপা করবেন। তাই বলছিলাম কি—একটুও দেরী কোর না—আমি এই ফাগুনেই শঙ্করের সঙ্গে প্রমিতার বিয়েটা দিয়ে কাজটা সেরে নিতে চাই?

নিমেষে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার প্রমিতার দিকে। বিস্ময়ে হতবাক হলেন। লাজ রক্তিমতার এতটুকু চিহ্ন পেলেন না ও মুখে। যেমনি জীবন্ত, তেমনি সমুজ্জ্বল। জানলার বাইরে প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে রয়েছে ওই চোখ—অকম্পিত দুটি প্রদীপ শিখা। মনে হলো ডাক্তারের, ওই জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব প্রতীক্ষায় রত ছিল এক তপস্বিনী আপন তপস্যায়। আজ ব্রত অন্তে সাফল্যের দীপ্তি সর্বাঙ্গে।

তপস্যা-সিদ্ধার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে এক সময় বললেন ডাক্তার—আশীর্বাদ করো ছোট মা, শঙ্করকে যেন আনতে পারি! আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সুধাময়ীর প্রসারিত পায়ে মাথা রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারের চিবুক স্পর্শ করে চুমা খেয়ে হাসলেন সুধাময়ী।

—বিজয়াদশমী ত অনেক দিন হয়ে গেছে কালো?

—হনুমানের কাছে প্রতিদিনটাই রাম-নবমী। এস প্রমিতা—ওরে বাস্‌রে। হাত ঘড়িটা দেখে ডাক্তার যেন লাফিয়ে উঠলেন—আর দাঁড়িয়ে থেক না! এদিকে সরে দু'পা গিয়েই ফিরে দেখলেন প্রমিতা দাঁড়িয়ে একই ভাবে। তফাতের মধ্যে দেখলেন ডাক্তার—দুটি প্রদীপ্ত শিখার কোণ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। নিজের

ডান হাতের মধ্যে প্রমিতার একটি হাত ধরে বাঁ হাতটা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন—এই হাতটা খালি রাখলাম ছোট মা, শঙ্করের জন্যে! কই রে আনন্দি, গেলি কোথায়? গোটাকতক পান দে বাবা!

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কথাটা এতকাল শোনাই ছিল কিন্তু তার নগ্ন মূর্তি যে কতখানি বেদনাদায়ক, ডাক্তার বা প্রমিতার কোন ধারণাই ছিল না। বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে দুজনে দেখল, কার যেন মৃত্যু হয়েছে। গোটা ধরমশালাটা শোকার্ত পরিবারের মতন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

হোটেলে মালপত্তর রেখেই ডাক্তার প্রমিতাকে নিয়ে পা বাড়ালেন সরকারি হাসপাতালের দিকে। যদিও এখন অপরাহ্ন বেলা, তবুও মেঘের চাপে চারদিকে ছমছমে অন্ধকার।

কিছুটা পথ ত পেরিয়ে এল, কিন্তু দু'জনেই নির্বাক। একটা চড়াই পথ পেরিয়ে ডাক্তার কথা বললেন শেষ পর্যন্ত।

—বড় লজ্জা পেলুম। সংসারের বড় জিনিসটাকে সেদিন কিনা আমায় দেখতে হল এক বুড়ির চোখ দিয়ে?

এ কিসের ইঙ্গিত প্রমিতা বুঝেও কোন উত্তর না দিয়ে চলতে লাগল।

—সেবার ধরমশালায় যদি অন্ধ হয়ে না থাকতাম—বাঁ হাতের লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বললেন ডাক্তার—তাহলে কী আজকের অবস্থা ঘটতে দিতাম? দুর্ভাগ্য আমার!

ডাক্তারের হতাশাই যেন প্রমিতার মুখ খোলাল।

—কী করতেন তাহলে?

—বন্ধুর জন্যে বন্ধুর যা করা উচিত।

—অর্থাৎ শাঁখ বাজাতেন?

—ঠিক তাই। কী হল দাঁড়ালে যে?

প্রমিতা দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণভাবে ডাক্তারকে দেখে একটু হাসল—

ভাগ্যিস নিজের চোখে দেখেননি! দেখলে শাঁখ বাজাতেন কি না—কে জানে?

—এ সন্দেহের কারণ? ডাক্তারও এবার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

—কারণ, আত্মাভিমানে প্রমিতার গলাটা ধরে এল, বলল,

—সংসার খেদানো ছেলে—যোগ্যতার মধ্যে মদের নেশা আর টাকা ধার করার অভ্যেস—পারতেন কি ঠিক—

—প্রমিতা আবার চলতে শুরু করল। কিছুটা এসে ডাক্তার বললেন—তোমার অনুমান তুমিই জান, কিন্তু দেখছি, তুমি নিজেই নিজের মনের কুয়াসার তলায় চাপা পড়ে আছ। মুখ তুলে প্রমিতা তাকাতেই তিনি বললেন—কী যেন বলে, অনির্বাণ শিখা—শুনেছি তার দাহে নাকি সমস্ত বিরূপতা, অপবাদ সব সুন্দর হয়ে ওঠে। তাছাড়া—

—তাছাড়া? প্রমিতা ডাক্তারকে যেন চাপ দিল কথাটা শেষ করার জন্যে।

—তাছাড়া ওই যে বললে—সংসার-খেদানো। এইসব সংসার-খেদানো, সংসার-অবাঞ্ছিত—এদের মধ্যে নিজিকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কী মারাত্মক রকমের একটা তৃপ্তি নেই? তার সন্ধান কী আজও তুমি পাওনি?

মনে পড়ল প্রমিতার রুক্মিণীকে। ডাক্তারের এ মন্তব্য যেন তার আত্মপরিচয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। কিন্তু আশ্চর্য হল সে নিজের কাছেই আজ। আজ কোন বিরূপতাই মনে এল না তার। বরঞ্চ যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দ ভোগ করল। বলল ধীর গলায়—পেয়েছি বৈকি, নইলে যার যত অনুরোধই থাক, আহত একটি লোককে দেখতেই শুধু আসতাম—আর কিছুরজন্যে নয়।

কথায় কথায় এসে পড়েছে সরকারি চিকিৎসালয়ের কাছে। বিরাট বাগানের মধ্যে টালিছাওয়া সার সার ঘর। ঘরের কোলেই টানা বারান্দা। এদিকে একটা ছোট কাঠের বাড়ি—বোধ হয় অফিস ঘর। বাগানের শেষ দিকে আর এক মস্ত বাড়ি। হয় ডাক্তারদের কোয়ার্টার,

না হয় বিশেষ রুগী থাকার ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে একটি মনোরম শান্ত শ্রীমণ্ডিত আরোগ্য নিকেতন যে কোন লোকের দৃষ্টিতে ধরা দেবে।

কাঠের দরজায় হাত রেখেছেন ডাক্তার। প্রমিতার ডান হাতটা সহসা এসে ঠেকল। চোখ তুলতেই দেখলেন ডাক্তার রক্তশূন্য মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে প্রমিতা চেয়ে রয়েছে ওই লম্বা টালিছাওয়া বাড়িটার দিকে। প্রমিতার এই রূপটা ডাক্তারের ভেতরে নাড়া দিলেও বাইরে রইলেন শান্ত গম্ভীর।

—দাঁড়ালে যে?

—যদি সব শেষ হয়ে গিয়ে থাকে?

—আমাদের বিধানে শেষ বলে কিছু নেই প্রমিতা।

—কিন্তু আমার? সকরুণ দৃষ্টি মেলে এমন ভাবে চাইল প্রমিতা, ডাক্তার চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন।

—তোমাদেরও। প্রমিতার পিঠে হাতটা রেখে বললেন ডাক্তার —সহজাত শক্তির জোরেই ত সাবিত্রী সত্যবানকে একদিন ফিরে পেয়েছিল। চল এবার আমরা যাই।

গেটটা খুলে ডাক্তার প্রমিতাকে নিয়ে অফিস ঘরে এলেন। ঘর তখন শূন্য। আশেপাশে কাউকে দেখা গেল না। এবার এলেন রোগীদের ওয়ার্ডে।

বিনা অনুমতিতে ওয়ার্ডে প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয় তবু ডাক্তার প্রমিতাকে নিয়ে বাধ্য হয়েই এলেন, কারণ সেখানে না পাওয়া গেল কোন নার্স, না কোন ডাক্তার। এমন কি জমাদার পর্যন্ত না।

ডাক্তারের বিস্ময় আর প্রমিতার ব্যাকুলতা যখন চরম সীমানায় এসে ঠেকেছে, দেখা পাওয়া গেল উর্দিপরা এক বৃদ্ধকে।

ডাক্তার তাকেই ধরে হিন্দিতে বললেন—তুমি কী হাসপাতালে কাজ কর?

—জী সাব্।

—বেশ, তাহলে আমাদের একটা খবর দিতে পার?

—আব বাতলাইয়ে ?

—হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার শঙ্কর বাবুকে চেন ?

—বহুত খুব।

—বেশ, তা শঙ্কর বাবু কোথায় তা বলতে পার ভাই ?

—শঙ্কর বাবু ?

—হ্যাঁ ভাই শঙ্কর বাবু ? প্রমিতা চুপ করে বোস এই বেঞ্চিটায় —হ্যাঁ শঙ্কর—

—আরে, শঙ্করবাবুকে লিয়ে ত আজ শভা হোতি। এতবড় ঘটনাটা এদের দুজনের অজানা দেখে বৃদ্ধ যেন ক্ষুণ্ণ হল।

—শভা কী ? বেঞ্চি থেকে উঠে এসে প্রমিতা ডাক্তারের হাতটা ধরল।

একবার এই বৃদ্ধ একবার প্রমিতা, দুজনকে দেখে ডাক্তার বললেন —বোধ হয় সভা। তাই না ?

—হাঁ, হাঁ ওই বাত ! বৃদ্ধ তৎপর বলে উঠল।

—সভা কী তাহলে ? প্রমিতার বিদীর্ণ কণ্ঠস্বরটা ডাক্তারকে বিব্রত করলেও তিনি বৃদ্ধকেই বললেন—শভা কাহে লিয়ে ?

—শঙ্কর বাবুকা ওয়াস্তে। শঙ্কর বাবু ত শভামে হ্যায়। আপ জানতা—

—হ্যায় ? ডাক্তার ও প্রমিতা এক সঙ্গেই বলে উঠল।

এরপর যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেল, জানা গেল সভা চলছে এখন। সবাই, অর্থাৎ ডাক্তার, নার্স অফিসবাবু এমন কি অনেক রুগী পর্যন্ত গেছে সভার শোভা বাড়াতে। বৃদ্ধের কাছ থেকে জেনে নিয়ে ডাক্তার ও প্রমিতা হাসপাতালের পিছনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সভা ঠিক আরম্ভের মুখে।

ফাঁকা জায়গাটা সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা রয়েছে। বাঁশের গায়ে অনেকগুলো প্রেটোম্যাক্স। পাহাড়ী ফুল আর পাইনপাতা দিয়ে সাজান এক মঞ্চ। মঞ্চের মধ্যস্থলে সেরবাণী পরা, মাথায় গান্ধী টুপি এক সৌম্য-কান্তি বৃদ্ধ বসে আছেন ফুল দিয়ে সাজান চেয়ারে। তাঁর ডান পাশে এক

বিদেশী, খুব সম্ভব ইংরেজ। বয়স ষাটের কোঠায় এবং তাঁর পাশে যে রমণী বসে—সম্ভব তাঁরই স্ত্রী। মহিলা যে বিশেষ আহত, দেখলেই বোঝা যায়—সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাণ্ডেজ। মুখের সামান্য অংশ মাত্র অনাবৃত! গান্ধী টুপী পরা বৃদ্ধের বাঁ পাশে শঙ্কর। শঙ্করের সর্বাঙ্গে ওই বৃদ্ধার মতই ব্যাণ্ডেজ। স্থানীয় নরনারীর সমাবেশে জায়গাটা সরগরম। ডাক্তার ও প্রমিতাকে চেয়ারের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হল প্যাণ্ডেলের শেষ অংশে—যেখানটায় আলো বলতে নেই।

সভার প্রাথমিক কাজ শেষ হল। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন ওই বৃদ্ধ করতালির মধ্য দিয়ে।

আমন্ত্রিতদের ধন্যবাদ দিয়ে এ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা যা দিলেন, তার সার অংশ দাঁড়ায় এই রকম—"গত সপ্তাহে ধরমশালায় ঘটে গেছে নিদারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ—তার কথা আর বিশেষ বলা নিরর্থক। কারণ এখানকার অধিবাসী মাত্রই তা অবগত আছেন। আপনারা এই যে আহত রমণীকে দেখছেন—তিনি এসেছেন সাগর পার থেকে এখানে বেড়াতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে। দুর্ভাগ্য তাঁর গত সপ্তাহে বেড়িয়ে যখন হোটেলে ফিরছিলেন—হঠাৎ পড়ে যান ঝড়ের মুখে আর তারই ফলে পড়ে যান এক ভীষণ খাদে। বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল কিন্তু সাহস করে কেউ খাদে নামেনি—খাদে নামা মানেই ত মৃত্যু। আমাদের হাসপাতালের কর্মসচিব—এই যিনি আপনাদের সামনে বসে শঙ্করলালজী, ডিউটি সেরে বাড়ি যাচ্ছিলেন। খাদের ভিতর থেকে এই রমণীর চিৎকার শুনে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে তখনই নেমে যান খাদে এবং ওপরে তুলে আনেন—কিন্তু নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যান। তার চিহ্ন ত আপনারা নিজের চোখেই দেখেছেন। এই দম্পতী নিজের দেশে ইংলণ্ডে আগামীকাল ফিরে যাচ্ছেন। যাবার আগে আমাদের হাসপাতালের উদ্দেশ্যে দিয়ে যাচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা। আর শঙ্করলালজীর বিরাট কাজের জন্য তাঁকেও দিয়ে যাচ্ছেন পাঁচ হাজার টাকা। এই প্রসঙ্গে

এ কথা না বলে আমি পাচ্ছি না যে সারা ধরমশালার মধ্যে আমি সব চাইতে সুখী লোক—কারণ শঙ্করলালজী আমার আবিস্কার। যখনই শুনেছিলাম শঙ্করলালজী অবিবাহিত তখনই বুঝেছিলাম, আপনাদের সেবার কাজে ইনি উপযুক্ত হবেন এবং আমার ধারণা যে সত্য তার প্রমাণ ত আপনারা রোজই পান শঙ্করলালজীর কাজের মধ্য দিয়ে। হাসপাতালের পরিবেশই শঙ্করলালজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই রমণীকে বাঁচাতে। ভগবান শঙ্করলালজীর মঙ্গল করুন।"

করতালির দাপটে সামিয়ানা যেন উড়ে যাবার অবস্থা। শব্দ একটু কম হতে জনতার মধ্যে থেকে দাবি উঠল, "আমরা শঙ্করলালজীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।"

—তবেই হয়েছে! মুখে আঁচল চাপা দিয়েও প্রমিতা হাসি চাপতে পারল না।

—ভুলে যেও না বাঙ্গালী।

ততক্ষণ শঙ্কর মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ডান হাতটা তার প্লাস্টার করা। গলা ঘিরে নেমে আসা একফালি ব্যাণ্ডেজে সেটা বাঁধা ঠিক বুকের কাছ বরাবর। শীর্ণ মুখে তখনও একটা বেদনার অভিব্যক্তি। রুক্ষ চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠস্বরের সম্মোহনী শক্তি মুহূর্তমধ্যে চঞ্চল বাকস্ফূর্ত জনতাকে নিথর নিস্পন্দ করে তুলল।

—"আমার এই সামান্য, তুচ্ছ কাজের জন্যে এই মহিলা টাকা দান করে—আমার ত মনে হয়, হৃদয়ের মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। হাসপাতালের উদ্দেশ্যে টাকা দান মানেই টাকার সদ্ব্যবহার। কিন্তু আমায় দান করা অপাত্রে দান। এ পাঁচ হাজার টাকা, অন্তত মানুষ হিসেবে আমার নেবার অধিকার নেই।"

বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? মন্তব্য না করে যেন স্থির হতে পারল না প্রমিতা।

—সব না শুনে কিছু বলা যায় না। এক দাবরানিতে যেন ডাক্তার প্রমিতাকে বসিয়ে দিলেন।

"আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন"—

মন্ত্রমুগ্ধ নর-নারী শঙ্করের বাণী তখন শোনার আগ্রহে আকুল, "এটা আমার চলতি বিনয় নয়। অকপটে স্বীকার করছি, টাকা নেবার আমি একেবারেই অনধিকারী। এ রমণী বেঁচেছেন—আর তা যদি হয় আমার হাত দিয়ে বিশ্বাস করুন, এই রমণী সেই সুযোগ দিয়ে আমায় ধন্য করেছেন, আমায় কৃতার্থ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমি কৃতজ্ঞ এ মহিলার কাছে।"

একটা যেন গুঞ্জনের শব্দ উঠল এতক্ষণে। শঙ্করের বক্তব্য যে পরিস্ফুট হয়নি, তা বোঝা গেল এই কানাকানিতে। দেখা গেল সভাপতি মহাশয়ও উঠে এসে কি যেন বললেন শঙ্করের কানে।

"আমার কৃতজ্ঞতার কারণ" শঙ্কর একইভাবে দাঁড়িয়ে তার অসম্পূর্ণ কথার সূত্র ধরল—"নিতান্তই ঘরোয়া। তা যদি আপনারা শুনতে চান, তা'হলে আমার জীবনের দশ বছর আগের একটি ঘটনায় আপনাদের ফিরে যেতে হবে। তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন—কেন টাকা নেবার অধিকার আমার নেই।"

—দশ বছর আগে? প্রমিতা যেন ককিয়ে উঠে অজান্তে ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরল।

—আঃ, শুনতে দাও! ডাক্তার আর একটু এগিয়ে এলেন।

শঙ্কর নিঃশ্বাসরুদ্ধ জনতাকে বলছে তখন—থাকি কলকাতায় নিজের বাড়িতে। কলেজের পাঠ শেষ হয়েছে—নেশা ধরল মদের। কেমন করে ধরল বলা শক্ত। সাফাই গাইতে বলা যায় সঙ্গ দোষ, কিন্তু আমি বলি আত্মদোষ। সেই নেশার খরচ তুলতে ধরলাম রেস। প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে। কথাটা মার কানে যেতে তিনি অনেক কিছু করলেন—এমন কি গুরুর দিব্বি পর্যন্ত দিয়েও ছেলেকে শোধরাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর চোখের জলই সার হল। এক শনিবার রেস-মাঠে যাব, সিঁড়ি দিয়ে নামছি—মুখোমুখি হলাম মার সঙ্গে। তিনিও ছাড়বেন না, আমিও যাব। গালমন্দ, অনুনয়, অনুরোধ সব করেও যখন কিছু

হল না—শেষে দুহাত দিয়ে পথ আটকালেন। তখন রেসের প্রথম বাজি আরম্ভ হবার সময়—কাজেই আমিও পথ পরিষ্কার করলাম তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে। মাঠ থেকে ফিরে শুনি মার পেছনের হাড় ভেঙ্গে গেছে, এবং তাই হল তাঁর মৃত্যুর কারণ। দশ বছর আগে এক মাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আর এক মাকে এইমাত্র পাঁচ দিন আগে যদি আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে থাকি—তা করেছি নিজের গরজে, নিজের স্বার্থে—তাহল দশ বছর ধরে অসহ্য ভারবাহি এক অভিশপ্ত পচা দুর্গন্ধময় জীবন থেকে মুক্তি পাব বলে। এই মহিলা আমায় নতুন জীবন দিয়েছেন। তাঁকে সেবা করবার সুযোগ পেয়ে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম তাঁর কাছে।—এইবার আপনারাই বলুন, এই টাকা নেবার ধর্মতঃ কোন অধিকার আমার আছে কি না? বলুন?”

সমস্ত সামিয়ানা জুড়ে নেমে এল নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল সভাপতি মহাশয়কে শঙ্করের পাশে এসে দাঁড়াতে। জনতা শুনল তাঁর বাষ্পার্দ্র কণ্ঠের পুনঃ ভাষণ।—“শঙ্করলালজীর মুখেই তাঁর জীবন কাহিনী শুনলেন। কিন্তু কি বুঝলেন আপনারা? এ কথা কী সত্য নয় আজ সমস্ত রমণীই শঙ্করলালজীর কাছে মা। সব রমণীকে মা বলে দেখেন বলেই নিজের জীবন বরবাদ করে এই মহিলাকে বাঁচিয়েছেন।”

প্রচণ্ড করতালির শব্দ মধ্যে বৃদ্ধের ভাষণ চাপা পড়ে গেল। চাপা পড়ে গেলেও জনতা বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখল এ ধ্বনি যেন বৃদ্ধের ভাষণ-অগ্নিতে ঘৃতাঞ্জলীর কাজ করেছে। চশমাটা খুলে স্খলিত হাতে চোখের কোণ মুছে অন্তর আলোড়নকে প্রশমিত করলেন উপসংহারের।—“আমি বিদায় নিচ্ছি আমার শেষ কথাটি বলে—আমাদের পুণ্য ভারতের যে আদর্শ, রমণী মাত্রেই মা—শঙ্করলালজী তা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে। যে রমণীর মৃত্যুর জন্যে তিনি দায়ী, সে রমণী ছিলেন সম্পর্কে মা—আর যাকে বাঁচালেন সম্পর্কে কেউ না—কিন্তু তাঁকেই মা বলে দেখেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সব রমণীকে মা দেখেন বলেই শঙ্করলালজী আজও বিয়ে করেননি।

আবার উঠল করতালির শব্দ। কিন্তু সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে ডাক্তার শুনলেন প্রমিতার আর্তনাদ—চলুন!

—যাব কী? ডাক্তার যেন বিরক্ত হলেন। বললেন—সাহেব কি বলে শুনব না?

দেখা গেল ইংরেজ ভদ্রলোকটি তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন শঙ্করের বাঁপাশে। তাঁর মুখ দেখেই সভাপতি মহাশয় অনুমান করলেন এ বিদেশীও কিছু বলতে চান। হাত জোর করে সবাইকে নীরব হতে আহ্বান জানালেন। করতালি মুহূর্তে থেমে গেল।

"আমি শ্রোতা হয়েই এ সভায় যোগ দিয়েছি"—অত্যন্ত ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ইংরাজ ভদ্রলোকটি—"কিন্তু একটি কথা না বলে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর। মানুষই মানুষকে বাঁচায়। মার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করা—মোটেই বড় ব্যাপার নয়। এমন নজির অনেক দেশেই আছে। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষেই এমন মানুষ আছে যাদের কাছে আছে মহিলা মাত্রেই মা। একথা আমি শুধু বইয়েই পড়েছিলাম, আজ তার প্রমাণ পেয়ে—

হঠাৎ হাতের উপর মারাত্মক চাপ পেয়ে ডাক্তার বলে উঠলেন—কী হল?

—বলছি না চলে আসতে?

প্রমিতার প্রত্যয়দৃঢ় আদেশে ডাক্তার কেমন হয়ে গেলেন। তবু একবার বললেন—বলছেন অপূর্ব, শুনিনা শেষটা—

—আসুন আমার সঙ্গে, শেষটা আমি শোনাচ্ছি।

প্রমিতা একরকম জোর করেই ডাক্তারকে নিয়ে এল ফাঁকা মাঠে।

—হ্যাঁ, শেষটা? প্রমিতা মুখোমুখি দাঁড়াল ডাক্তারের। বলল—সব মেয়েই শঙ্করের মা। এবার চলুন?

—কোথায়?

—হোটেলে, তারপর কাশী। সহজভাবে বুঝিয়ে দিল প্রমিতা।

চমকে উঠলেন ডাক্তার—শঙ্করের সঙ্গে দেখা না করেই?

—হ্যাঁ, দেখা না করেই।

—আরে আমি বলছি শঙ্করের সঙ্গে দেখা করার কথা ?

—আমিও তো তাই বলছি—একটু হাসল প্রমিতা—তার আর কোন প্রয়োজন নেই। যাক, রাত হল চলুন এবার।

ডাক্তার এবার হাত ধরল প্রমিতার—দেখা না করে যাবার কারণ ?

—কারণ ? কালো কালো মেঘভরা বিদঘুটে আকাশে চোখটা তুলে বলল প্রমিতা—শুনলেন না, সমস্ত রমণী—নহ বঁধু, নহ বান্ধবী শুধুই মাতা !

এ যেন রুগীর প্রলাপ শুনলেন ডাক্তার। এক চোট হেসে বললেন—ও ত বুড়োর পাগলামি। ওর কী কোন মানে হয় ? চল চল শঙ্করের সঙ্গে দেখা করি ? প্রমিতার হাত ধরে টানলেন ডাক্তার।

শামিয়ানার তলা থেকে ভেসে এলো হর্ষোধ্বনি আর করতালির কান ফাটানো শব্দ। ডাক্তারের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ত্নহাতে নিজের কান চেপে ধরল প্রমিতা। শব্দটা মন্দীভূত হতে বলল—কে জানে মানে আছে কিনা! কিন্তু ডাক্তার এটা ত ঠিক, ওই বৃদ্ধ আর এক পরদেশা ধরমশালাকে সাক্ষী রেখে আজ যে আসনে শঙ্করকে হাতে ধরে বসিয়ে দিলে—নিজের স্বার্থের জন্যে প্রমিতার ত উচিত নয়, সে আসন থেকে শঙ্করকে আবার নিচে নামিয়ে আনা। সেই ভাল ডাক্তার, ও ধরমশালার হৃদয় আসনে বসে থাকুক—প্রমিতা ফিরে যাক শুধু হাতে।

ডাক্তার এবার অনেকক্ষণ ধরে প্রমিতাকে দেখে বললেন এক সময়—কিন্তু তোমার শাশুড়ি, আমার ছোট মা যে পথ চেয়ে বসে আছেন ?

ঠাণ্ডায় বোধ হয় প্রমিতা কেঁপে উঠল। গায়ে শালটা দিয়ে বলল—শঙ্করের এতবড় কাজটা শুনলে আনন্দই পাবেন।

—কিন্তু তার পরেরটা ? অধীর হলেন ডাক্তার।

আবার হাসল প্রমিতা—একটু আগে আকাশটা দেখছিলাম সামঞ্জস্যহীন তার রূপ। আমার আকাশটাও ঠিক ওই রকম—আঃ, আর যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না!

—বেশ, এসেছি যখন, তখন শঙ্করের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই ? অন্ততঃ তার আঘাতের খবরটা নিই ? চল প্রমিতা ? ডাক্তার প্রমিতার পিঠে হাত রেখে আহ্বান করলেন।

—কী লাভ ? ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টেনে বলল প্রমিতা—এক আঘাতের খবর নিতে গিয়ে আর এক আঘাত দিয়ে কী লাভ ? বরঞ্চ এই ত ভাল, যে এল সে চলে গেল -- তার আসা-যাওয়া দুটোই রইল শঙ্করের কাছে অজানা।

সভা ভাঙ্গল এতক্ষণে। প্রমত্ত উল্লাসে সবাই বেরিয়ে আসছে। সবায়ের মুখে শুধু একটা কথা—শঙ্করের জয়ধ্বনি। প্রমিতা পথ ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের তলায় অন্ধকারে এসে দাঁড়াল।

ফাঁকা আসর থেকে বেরিয়ে এলেন ইংরাজ ভদ্রলোকটি তাঁর আহত স্ত্রীকে নিয়ে। পিছনে শঙ্কর এক রকম সভাপতি মহাশয়কে ভর করে হাঁটছে আস্তে আস্তে। ওরা এগুচ্ছে হাসপাতালের দিকে। কে একজন এসে আলোগুলো নিয়ে গেল।

আলোহীন ফাঁকা সভার দিকে চেয়ে থাকা প্রমিতার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন ডাক্তার—চল, এবার আমারা হোটেলে যাই!

বিছানায় বসেই সুধাময়ী সন্ধ্যাআহ্নিক শেষ করলেন। জ্বরটা গেছে বটে কিন্তু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আর বুকের ব্যথাটাও রয়েছে একইভাবে। চোখে চশমা দিয়ে বইটা হাতে নিয়েছেন। বাড়ির দোরগোড়ায় সাইকেল রিক্শা দাঁড়ানোর শব্দ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অত্যুগ্র শক্তি যেন তাঁকে ধরল। উঠে এসেই জানলার গরাদটা ধরে ফেললেন। হ্যাঁ, ঠিকই ত। ওই ত নামছে বৌমা রিক্শা থেকে, কিন্তু একটা কেন ? আর কোথায় ? না, ওই ত কালোও এসে গেছে—কিন্তু তারপর ? কৈ, আর কৈ ? ওই ত ওরা দাম চুকিয়ে দিয়ে বাড়িতে ঢুকছে। তাহলে, তা হলে কী—

পাশের ঘরে রাঁধছিল আনন্দি। কার যেন পড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়ে জ্বলন্ত কড়া ফেলে রেখেই ছুটে এল এ ঘরে। আরে ব্যস্! মাইজী গির গিয়ে?

বার দুই নাড়া দিয়েও সুধাময়ীর কোন সাড়া না পেয়েও একবার চেঁচিয়ে উঠল আনন্দি। নিচে আছে অতুলের মা। তাকে ডাকবার জন্যে উল্কাবেগে নামতে গিয়ে ধাক্কা খেল আনন্দি ডাক্তারের সঙ্গে নিচের তলায়।

—মাইজী মর গিয়া।

—মর গিয়া? তিন লাফে ডাক্তার উঠে গেলেন উপরে। মালপত্তর মিলিয়ে দেখছিল প্রমিতা। কথাটা কানে যেতে শুধু চেয়ে রইল আনন্দির দিকে। কতক্ষণ চেয়েছিল সে নিজেই জানে না। আনন্দির স্পর্শ পেয়ে এইবার বুঝতে পারল প্রমিতা, যে তুহিন প্রবাহটা একটু আগে তাকে অনুভূতিশূন্য সম্পূর্ণ জড় করে দিয়েছিল সেটা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

—আরে দিদিমণি উপর চলিয়ে?

প্রমিতার অস্বাভাবিক তীব্র একটা কাঁপুনি এল এই মুহূর্তে কোথা থেকে কে জানে। অস্বাভাবিক অসহনীয়। আনন্দিকে ধরতে গিয়ে সিঁড়িতে বসে পড়েই নিজেকে নিজে বলল প্রমিতা—মা তাহলে—

এক সময় অতুলের মা আর আনন্দি প্রমিতাকে উপরে এনে সুধাময়ীর ঘরে দাঁড় করাল।

ডাক্তার একটা বড় চামচের সাহায্যে সুধাময়ীর বন্ধ দাঁতের পাটি ফাঁক করে ওষুধ দিলেন—বোধ হয় কোরামিন। এইবার ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ বার করলেন।

—আর কী প্রয়োজন আছে? সুধাময়ীর ভুলুণ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চাইল প্রমিতা ডাক্তারের দিকে।

—রুগীর শ্বাস আর ডাক্তারের আশ। সুধাময়ীর ডান হাতে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে ডাক্তার বললেন—এখন এস, শুইয়ে দিই খাটে?

আস্তে আস্তে সুধাময়ীকে শুইয়ে দেওয়া হল খাটে। ডাক্তার

বসলেন মাথার কাছে। প্রমিতা সুধাময়ীর পা দুটো তুলে নিল কোলে। দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করে অস্বস্তি-ধ্বনি শুনিয়ে চলল।

কোন মন্দিরের প্রভাতী সানাইয়ের শব্দে ডাক্তার নেমে এলেন খাট থেকে। কোটটা কাঁধে ফেলে বললেন—বাড়িটা ঘুরে আসি, ওষুধ আনতে হবে। তুমি এবার কিছু মুখে দাও? আমি এলাম বলে!

—একটা কথা? সুধাময়ীর পা দুটি বিছানায় রেখে উঠে বলল প্রমিতা—মার এ স্ট্রোকের কারণ?

রাত জাগানিয়ার মুখে কি দেখলেন ডাক্তার—তিনিই জানেন। বললেন একটু হেসে—অনেক কিছু হতে পারে।

এটা জবাব হল, ডাক্তারের উক্তি নয়। প্রমিতাও ঠিক ডাক্তারের মতই হাসল।

এবার ডাক্তার স্বাভাবিক হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, তাই সই এখন স্নান সেরে চা খাও ত!

—আমি জানি, তবু ডাক্তারের মুখ থেকে একবার শুনতে চাই? প্রমিতা মুখোমুখি দাঁড়াল ডাক্তারের।

ট্রেনে আসার ক্লান্তির সঙ্গে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষতাকে ডাক্তারের মনে হল বাজে পোড়া একটা গাছ যেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। কি বলতে গিয়েই তার হৃদপিণ্ড যেন চমকে উঠল।

—শঙ্করকে না পাবার কারণই এই স্ট্রোক—তাই না ডাক্তার?

সত্যকে স্বীকার করে যদি এ অশান্তি কমে—সেই আশায় নিরুপায় ভেবে বলতে হল ডাক্তারকে—হয়ত তাই।

—তা হলে এই দাঁড়াল, মার মৃত্যুর কারণ আমি?

আঁচলটা খসে পড়েছে, রুক্ষ চুলের রাশ সারা পিঠে ছড়ান, রুক্ষ চাহনি। ডাক্তারের সামনে দাঁড়িয়ে আপন রুধির পানরতা ছিন্নমস্তা। কোটের বোতাম লাগাবার কারণে ডাক্তার মাথা নত করলেন।

—তাই না ডাক্তার?

প্রমিতার এ সমর্থন চাওয়া যদি নিজেকে অনুতাপের অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত করার কারণ হয়—তাহলে ডাক্তার মাত্রেরই আশু কর্তব্য প্রতিকার করা।

—সে ইঙ্গিত কী—স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য রেখেই বললেন ডাক্তার—আমি দিয়েছি? বলেছি কী প্রমিতা, এবার গঙ্গাজল জোগাড় কর?

—তাহলে কী আশা করব—ডাক্তার এবার রুদ্রাণীর গলায় ভিখারিণীর কান্না শুনল—মাকে জানাতে পারব, শঙ্করের জন্যেই শঙ্করকে তোমার কাছে আনতে পারিনি মা? বল ডাক্তার. পারব ত? সুযোগ পাব ত?

দুই চোখের জলের ধারা গাল বেয়ে পড়ছে মাটিতে। কঠিন ভাবে ডাক্তারকে ধরেও প্রমিতার কাঁপুনির শেষ নেই।

ঘরের কোণে রাখা খালি চেয়ারটায় জোর করে প্রমিতাকে বসিয়ে দিয়ে অনন্যোপায় ডাক্তার চিরাচরিত সান্ত্বনা দিলেন—তাই ত আশা করি প্রমিতা।

একটা অদ্ভুত শব্দ উঠল সুধাময়ীর গলা দিয়ে এ সময়। ডাক্তার বিদ্যুৎদ্রুত এসে সুধাময়ীর নাড়ি ধরলেন। এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এল সুধাময়ীর দাঁতের ফাঁক দিয়ে। প্রমিতা আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিল।

শব্দটা ওই একবারই। যেমন ছিলেন সুধাময়ী তেমনি রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে ডাক্তার তাঁর হাতটা নামিয়ে রেখে নিজেকে যেন একটু আড়াল করতে চাইলেন প্রমিতার কাছে। কিন্তু নিরর্থক হল সে প্রচেষ্টা। প্রমিতা ততক্ষণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—সে আশা কী এখনও আছে?

ডাক্তার প্রমিতার কাছ থেকে সরে এসে পুবের জানলাটা খুলে দিলেন। স্বর্ণচ্ছটায় বদ্ধ ঘরটা যেন মুহূর্তে ঝলমলিয়ে উঠল। স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শে ডাক্তার এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেলেন। রুগীর চরম মুহূর্ত আসন্ন দেখেও অকম্পিত হাতে যাকে তার কর্তব্য করে যেতে হয়েছে বহুবার বহুস্থানে শোকার্ত পরিবারের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যেও—তার

কাজ ব্যাধির সঙ্গে লড়াইয়ের—আশা দেবার নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন ডাক্তার—বলেছি ত রুগীর শ্বাসই হল আমাদের আশ। একটু হেসে আবার বললেন—আর যদি নিরাশই হতে হয়, তোমার দুঃখের কোন কারণ নেই প্রমিতা?

—নেই?

প্রমিতার এ আর্তনাদ ডাক্তার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। বললেন দৃঢ়ভাবে—শঙ্করকে এ বাড়িতে না আনা ছোটমার এ অবস্থার কারণ নয়—কারণটা আরও সাংঘাতিক।

সুধাময়ীকে দেখে ডাক্তারের আরও কাছে এল প্রমিতা—কী সেটা?

ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন একইভাবে—শঙ্কর সম্বন্ধে ছোটমার চরম অনুমানটাই এ অবস্থার কারণ। শঙ্কর বেঁচে আছে এ খবরটা যদি কোন রকমে আমরা জানাতে পারি, দেখবে মার নাড়ির গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। ও, আর দেরী করলে চলবে না! এবার আমি যাই!

—সেই সুযোগটা—জল ভরা চোখে ডাক্তারের হাত দুটি চেপে ধরে বলল প্রমিতা—অন্তত আমায় দাও ডাক্তার? আর আমি কিছু চাই না, কিছু চাইব না। শুধু—

ভিক্ষার্থীনীর এ আকুলতার কাছে সংসারের বহু ব্যথাবেদনা, বিপদ-বিপর্যয়-অভিজ্ঞ ডাক্তারও হার মানলেন এবার। ঘুরে দাঁড়ালেন এ দৃশ্য দেখার অক্ষমতায়।

সে দিনের ঘটনার কথা ডাক্তারের মনে পড়ল। একজনের স্বামী-চ্যুত হওয়ার দুর্ভাগ্যে আর একজনের মর্মস্পর্শী যন্ত্রণা ভোগ এই ঘরে ওই খাটে। তারপরই ত দিনে দিনে রোগ বৃদ্ধি। ডাক্তার হিসাবে একথা কোন মতেই ত অস্বীকার করা চলে না যে এই ক্রমবর্ধমান রোগ শারীরিক কারণে নয়। কারণ যা সে ত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান চিকিৎসার বাইরে। এ যাবৎ যা কিছু করা গেছে সে ত শুধু কাঠামোকে ঠেকিয়ে রাখার দরুণ। আর কিছু বা সান্ত্বনা দেওয়া নিজেকে এবং এই

ভিক্ষার্থীনীকে। অজানা ত তার নেই যে এ রোগ জীবাণু নাশ করে এমন ডাক্তার, কোন ড্রাগ আজও পাওয়া যায়নি। দৈবাৎ যদি বা শোনা গেছে এমন রুগীর ব্যাধি মুক্তির কথা—তা সম্ভব হয়েছে রুগীর আপন মনের মাধুরীতে যা ছিল মলিন যা ছিল কুরূপ তাই আলো হয়ে ফুটে উঠার দরুণ। একজনের ধূসর জীবনে সেই অপার্থিব আলো ফুটিয়ে তুলে নিজেকে নিরাময় করবার অত্যুগ্র আশায় হাত ত বাড়িয়েছিল এই রোগযন্ত্রণা কাতরা, কিন্তু সেই হতভাগিনী ত এক ফুঁয়ে আলোটা দিয়ে নিজের জীবন ধূসরতা আরো মসীকৃষ্ণ করে তুলল। শুধু নিজের গড়া অন্ধকারে শুধু কী নিজেই কালীলিপ্ত হল—রোগাক্রান্তকে সুনিশ্চিত নিরাময় করে তোলার পরিবর্তে টেনে আনল অন্তিম কালীমায়। আজ বা কাল হোক একদিন ত গোটা বাঙ্গালীটোলা এই অন্তিম কালীমা ঘটানোর কারণ হিসাবে আঙ্গুল দর্শাবে এই হতভাগিনীর দিকে। শেষ নিঃশ্বাস পড়ার মধ্য দিয়ে গোটা বাঙ্গালীটোলা দেখবে, একটি প্রাণের অবসান। কিন্তু কেউ ত দেখবে না নিঃশ্বাস ধারণের মধ্যে দিয়ে একটি প্রাণের ছেদহীন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ। তাই কী? কেউ কী নেই চোখ তুলে দেখবার? গলা ফুলিয়ে বলবার—রোগাক্রান্তার মৃত্যু হল মৃত্যুর কারণে।" এক অনমনীয় শক্তিতে তখনই ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

ঝুঁকে পড়ে সুধাময়ীকে দেখলেন। তারপর এলেন প্রমিতার সামনে। কাঙ্গালিনী এই একটু আগে তার কৃত কাজের একটি মাত্র জবাব দেবার জন্যে রুগীর ক্ষণকালের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে তাকে সকাতরে যে অনুরোধ করেছিল চোখের জলের মধ্য দিয়ে—রুগীর বর্তমান অবস্থা বিশেষে ডাক্তার হিসাবে তা দিয়ে অপারক সত্য, কিন্তু বন্ধু হিসাবে কী কিছুই দেবার নেই তাকে?

—আমি বিশ্বাস করি আর না করি কিছুই যায় আসে না প্রমিতা, কিন্তু ডাক্তারী করতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, অচৈতন্য মুমূর্ষু রুগীকে আত্মীয়-স্বজনরা চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছে। তার যদি এতটুক সার্থকতা থাকে, তাহলে তোমার চোখের জল বিফলে

যাবে না। শঙ্করের জন্যেই যে শঙ্করকে ছেড়ে এসেছ, ছোট মা তা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। একটু বাহ্যিক চেতনা এল কি এল না কি যায় আসে প্রমিতা? আর না, ব্যাগটা দাও?

—তুমি ত হাসপাতালে যাবে? একভাবে ডাক্তারকে অনেকক্ষণ দেখে বলল প্রমিতা।

তাড়াতাড়ি যেতে গিয়েও দাঁড়ালেন ডাক্তার। মনে পড়ল কথাচ্ছলে সেই ত প্রমিতার ওই 'আপনি' বলাটা পালটাতে বলেছিল আর প্রত্যুত্তরে সেদিন শুনতে হয়েছিল সময় এলে আর অনুরোধের প্রয়োজন হবে না।—সময় কী আজই হ'ল তাহলে?

—সেই রকম ত ইচ্ছে।

—তাহলে রেণী পার্কে একটা ফোন করে দিও।

—রেণী পার্কে? মানে—

—নিখিলেশকে।

—অবস্থা যা, ফোনটা অবশ্য করাই উচিত। কিন্তু আমি যে ভাবছি অন্য কথা।

জানলার আর একটা পাল্লা খুলে দিল প্রমিতা। আলোতে অচৈতন্যাকে এক মনে দেখে উঠে এসে বলল—সে যদি এ অবস্থায় কারণ জানতে চায় কী জবাব দেবে—সেই কথা ত?

—ঠিক তার বিপরীত। ব্যাগটা প্রমিতার হাত থেকে নিয়ে বললেন ডাক্তার—নিখিলেশকে দেখে ছোটমার যদি কোন রকম রি-অ্যাকসান হয় সেই কথা?

—দেখে? হাসল প্রমিতা। বলল ধীর স্বরে—সে অবস্থা যদি সত্যিই আসে তাঁর গর্বের ধন কালোকে আশীর্বাদই করে যাবেন। তুমি ফোনটা করে দিও?

তবু ডাক্তার কথাটা না তুলে পারলেন না। বলল—ছোটমা বুঝি এই ইচ্ছেটা তোমায় জানিয়ে রেখেছিল?

—না।

—তবে?

—তাকে খবর না দেবার কথাও ত বলেননি কোনদিন। তাছাড়া আমি যে তাঁকে কথা দিয়েছি।

—নিখিলেশকে ?

প্রমিতার মৌনতা দেখে বললেন ডাক্তার—কবে ?

—বছর দুই আগে এই কাশীতে।

—ও তাহলে ত নিশ্চয়—আমি গিয়েই—এর মধ্যে মার জ্ঞান এলে ওই ছোট পিলটা তুমি—চললাম !

ঠিক সন্ধ্যের মুখে সুধাময়ীর শ্বাসের টান দেখা দিয়েছিল অল্পক্ষণের মতন। তারপর থেকে অবস্থা প্রায় একই রকম। তাঁর মাথার কাছে বসে প্রমিতা হাত-পাখাটা নিয়ে। আনন্দি পায়ের কাছে! ওদিকের জানালার কাছে ইজিচেয়ারে শুয়ে ডাক্তার। টেবিলল্যাম্প জ্বলছে টেবিলের কোণে।

প্রায়ান্ধকার ঘরে কার যেন ছায়া এসে পড়ল। একটা নয় পরপর আরো—।

প্রমিতা নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এসে আস্তে বলল—এস! এবার বড় আলোটা জ্বেলে দিল।

ঘরভরা আলোতে সউল্লাসে ডাক্তার বললেন—আরে এস! নিখিল এস! থাক থাক পায়ের ধুলো—ওসব আবার—ততক্ষণ তাঁকে নিখিলেশ একাই প্রণাম সারল না, শাড়ি পরিবৃতা তার বিদেশিনী স্ত্রীও।

এমন আকস্মিক ঘটনায় বোধ হয় ডাক্তার বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। সেটা সামলে নিয়ে বললেন এবার ইংরেজীতে—তুমিও আসবে—আমরা কিন্তু ভাবতে পারিনি! বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েই আবার বসে পড়লেন যখন বিদেশিনীর গলা থেকে বাঙলা ভাষায় উত্তরটা পেলেন।

—আপনারা দয়া করে এ সময় খবর দিয়েছেন আর আমি আসব না? বলেই প্রমিতাকে প্রণাম করতে গিয়ে দীয়ের হাত দুটি বন্দি

হয়ে গেল প্রমিতারই হাতের মধ্যে! এরপর কিছুক্ষণ চাপা কণ্ঠে ডাক্তার নিখিলেশের মধ্যে আলোচনা চলল রুগীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে। সে আলোচনার মধ্যে দুজনেই এক সময় দেখল নবজাত শিশুটির কোল পরিবর্তন হয়েছে। আয়ার কোল থেকে চলে এসেছে প্রমিতার কোলে।

নিজের জায়গায় লীকে বসিয়ে প্রমিতা ওঘর থেকে ঘুরে এসে এক সময় বলল—এস, পাশের ঘরে চা দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার, তোমরাও চলবে ?

কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে ডাক্তারও বললেন—ছোটমার শোওয়া থেকেই ত সব অচল হয়ে গেছে—ভাগ্যি তোমরা এলে ভাই।

এক সঙ্গে সবায়ের মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠল।

একটু রাতই হল আহার পাঠ চুকতে। এদের আগেই হয়ে গেছে। সবাই এখন সুধাময়ীর ঘরে। আনন্দির ভাগ দিয়ে, সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে প্রমিতা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল নিজের ঘরে। অন্ধকার ঘরে বারান্দার এক ফালি আলো এসে পড়ছে।

তক্তপোষের উপর ছোট বিছানায় সেই ত ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বালিশের উপর ছোট পা-টি তুলে দিয়ে ঘুমচ্ছে এখন অকাতরে। সদ্য ফোটা একটি গোলাপ।—রংটা! তা বাপের মতই। কিন্তু মুখের আদল ঠিক মা-র মতন। কিন্তু কি স্বাস্থ্যবান এই বয়সেই, যেন একটি—ছাঁৎ করে উঠল প্রমিতার বুকটা সঙ্গে সঙ্গে। তখনই পা চালিয়ে চলে এল গঙ্গার দিকের বারান্দায়।

ত্রয়োদশীর রাত, পূর্ণিমা পক্ষ চলছে। মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমার দ্যুতি ছড়িয়ে রয়েছে উত্তর বাহিনীর সারা অঙ্গে। একের যোগে অপরের এই যে নিবিড় পরিপূর্ণতা—এই যেন প্রথম ধরা পড়ল আজ প্রমিতার চোখে।

দিগন্ত জোড়া আকাশ যার অঙ্গকান্তির কাছে আজ অন্ধকার হতমান, সে ত এই নীলিমার লাবণ্য পেয়েছে বলেই না। না পেলে আকাশ ত শুধু বাষ্পের ঘনীভূত একটা আচ্ছাদন। ছলছল্ শব্দটি আছে বলেই গঙ্গার এত আদর, তাই না সে সুরতরঙ্গিনী। সুর-হিল্লোলটুকু বাদ দিলে ত একটা জলাশয় শুধু। হাওয়ার স্পর্শযোগেই ত ফুলের পরিচয়—তখনি ত দিকে দিকে রোমাঞ্চ। চাঁদের আবির্ভাব যোগেই ত সাগরের বক্ষস্পন্দন।

প্রমিতাকে আবার কে যেন টেনে আনল এ ঘরে। অল্প আলোয় স্পষ্ট কিছুই নয় অথচ প্রমিতার চোখে এখন কিছুই অস্পষ্ট নয়। মশারি ফেলা একটি অতি ছোট বিছানায় একটি মানব শিশু। সদ্য ফোটা একটি চারা। ওই চারাটির আবির্ভাব ক্ষণেই ত শস্যশালিনীর মর্যাদায় ভূষিতা হয় সে, যে ছিল একদিন কর্কশ নিরেট অনুর্বর ঢেলা শুধু। তখনই ত অন্তহীন কালের বাণীর ঘোষণা—'আমি তোমার রসে পুষ্ট, তুমি আমার আবির্ভাবে ধন্যা। আমরা ছুয়ে এক, আবার একে ছুই।'

বসল প্রমিতা তক্তাপোষের একধারে। মশারিটার মধ্যে একবার বিছানাটা হাত দিয়ে দেখল ভিজে কি না। স্পর্শ পেয়ে শিশুটি চিৎ হয়ে শুলো। পা-টা নেমে এল পা-বালিশ থেকে। একপাশ দেখা মুখটির এবার সবটাই প্রত্যক্ষ হল।

একজনের ঘুমনিবিড় মুখ দেখার মধ্যে বোধ হয় কিছু দর্শনদোষ আছে। নইলে অদূরে উপবিষ্টার হৃদয়ে কিসের এই হাহাকার এই মুহূর্তে। নিচু হয়ে কি যেন শব্দ শুনল প্রমিতা পাশের ঘর থেকে। নিজের চুলের ঝুঁটিতে যেন টান পেল। ত্বরিতবেগে উঠে দাঁড়াল। তার যা কিছু সবই ত ওই পাশের ঘরে, ওই শয্যাশায়িনীর সঙ্গে, যার অন্তিম মুহূর্ত নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে দ্রুতবেগে— আর সে কিনা এ ঘরে পরগাছি ফুলের কমনীয়তা নিয়ে চিত্তবিলাসে মগ্ন? ঘরের দেয়ালে নিজের মুখটাই ঘসরাতে চাইল প্রমিতা।

চোখে মুখে জল দিয়ে এক সময় এ ঘরে এল। পরিবর্তনের মধ্যে দেখল গায়ের চাদরটা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে সুধাময়ীর গা থেকে। একটার জায়গায় দুটো বালিশ দিয়ে মাথাটাও কিছু উঁচু করা হয়েছে। ঘড়িতে বাজল একটা।

লী প্রস্তুত হয়েই ছিল। ইতিমধ্যে একটা পাতলা বিছানা করে রেখেছিল মাটিতে। তার অনুচ্চ গলায় প্রমিতাকে শোবার অনুরোধ—ডাক্তার শুনতে পেলেন। গোটাকতক পান মুখে দিয়ে বললেন—একটু গড়িয়ে নাও? আমরা ত আছি!

প্রমিতার ইচ্ছে হল বলে—সেটার প্রয়োজন ত তোমারও। কিন্তু সেটুকু বলার শক্তিও যেন নেই আর। বালিশে মাথা রাখল প্রমিতা।

ঘণ্টা দুয়েক কেটেছিল হয় ত। চাপা কণ্ঠস্বরের শব্দে উঠে বসল প্রমিতা তাড়াতাড়ি।

নাড়ি দেখছেন ডাক্তার। বেশ জোরের সঙ্গে হাওয়া করছে নিখিলেশ মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। 'হট-ওয়াটারে'র ব্যাগটা বুলাচ্ছে লী আস্তে আস্তে। বড় আলোটা জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সকালের মতই নিঃশ্বাসের টানটা হঠাৎ দেখা দিল। এবার আর অল্পক্ষণের মতন নয়—ছেদহীন বিরামহীন। কিছুটা তরল পদার্থও বেরিয়ে এল সুধাময়ীর ঠোঁটের পাশ দিয়ে।

সুধাময়ীর হাতটা ছেড়েই ডাক্তার ব্যাগে হাত রাখলেন। কি ভেবে হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে সুধাময়ীর হাতটা আবার তুলে নিলেন।

কিছুটা সময় কাটল।

হঠাৎ একটা বড় রকমের শব্দ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ীর নিঃশ্বাসের টানটা থিতিয়ে গেল। চাঞ্চল্য দেখা দিল নিখিলেশের মধ্যে। ওষুধ বা কোন ইনজেকশান দেবার অনুরোধ-ভরা দৃষ্টিতে চাইল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার শুধু হেসে পূব দিকের জানলাটা খুলে দিলেন।

অরুণোদয়ের জ্যোতির মধ্যে অন্ধকারের বিলুপ্তি ঘটছে তখন।

এক সময় সকলের শোক-পীড়িত দৃষ্টিতে চরম বিস্ময় দেখা দিল সকলেই দেখল সুধাময়ী চোখ খুলে কাকে যেন খুঁজছেন প্রসন্ন মধুর দৃষ্টিতে। দেখলেন একে একে সবাইকে। মাথাটা ফেরালেন খোলা জানলার দিকে—দৃষ্টি স্থির হয়ে এল। আদিত্যবর্ণ পুরুষের মহান আবির্ভাবটা বোধ হয় দেখে নিলেন।

ডাক্তারের ইঙ্গিতে সবাই সুধাময়ীর প্রশস্ত পায়ে মাথা রাখল।

মহান লগ্ন অতিক্রান্ত হল ধীরে ধীরে। নেমে এল নিঃসীম স্তব্ধতা।

এক সময় ডাক্তার নির্বিকার চিত্তে তাঁর সমস্ত জিনিষপত্র একে একে ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুরলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে সুধাময়ীর মুখটি ধরে নিশ্চিদ্র স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন—বড় সুন্দর খেলা দেখালে ছোটমা! মৃত্যুর সঙ্গে এমন হৃদতা এর আগে আর চোখে পড়েনি। শেষের দিকে তাঁর স্বরটা একটু ভারি বোধ হল।

এবার সুধাময়ীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রমিতাকে বললেন—এখন চলি! অনেক কিছু করবার আছে! এ দিকের যা করবার করে ফেল, আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি। তবে চলি ছোট—

যেতে গিয়েও শয্যা-শায়িনীর দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে গেলেন ডাক্তার। চশমাটা খুলে কোটের হাতায় চোখ মুছে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

প্রত্যুষলগ্নে প্রমিতা সুধাময়ীকে শুনিয়ে এসেছে শিববন্দনা একাদিক্রমে দু'বছর। কুলুঙ্গি থেকে বই নিয়ে যথারীতি বসল সুধাময়ীর মাথার কাছে। বইটি খোলা হল। কিন্তু এক অসহনীয় ব্যথায় কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীরে আজ আর সম্ভব হল না প্রমিতার পক্ষে একটি কথাও উচ্চারণ করা। হাত থেকে বইটা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময়ীর অনঢ় পা দুটি চেপে ধরল নিজের বুকে। সারা শরীরটা উঠল থর থরিয়ে।

সদ্য মাতৃহারা বিমূঢ় নিখিলেশ অত্যন্ত সাবধানে তার হাতটা রাখল শোক সন্তপ্তার মাথায়।

ওদিকে সুধাময়ীর মাথার কাছে বসা এক কর্তব্য নিষ্ঠার কাজ যেন শেষই হয়নি তখনও। হাত পাখাটা নিয়ে এক মনে লী হাওয়া করে চলেছে—যেন কোন ধূলা না পড়ে, মাছি না বসে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়া আনন্দির কান্নায় বাড়িটা তখন থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

গোরা ডাক্তারের ছোটমার শবানুগমনে অনেকেই যে এগিয়ে আসবে আগ্রহে—এতটাই জানা ছিল। কিন্তু জানা ছিল না কারুরই, সে-অনেকের সংখ্যা কত? সারা কাশী ভেঙ্গে পড়েছে কেদার ঘাটে।

বিপুল জনতা যখন শ্মশানধ্বনি দিয়ে শ্বেত বস্ত্রাবৃত চন্দনলিপ্তা সুধাময়ীর মরদেহটি তুলে নিল—নিখিলেশের পক্ষে তখন আর সম্ভব হল না নিজেকে সংযত রাখা। ধারা নেমে এল দু'চোখ দিয়ে এই জনতারই সামনে। কিন্তু এ অশ্রু যে জননীর মহাপ্রয়াণ জনিত চির বিচ্ছেদব্যথায় নয়—তা জানা গেল তারই কথায়। ভিড় থেকে এক সময় সরে এসে বাড়ির দুয়ারে দাঁড়ান নির্বাক প্রমিতাকে আনন্দদীপ্ত স্বরে বলল—মা কলকাতায় থাকলেও একদিন দেহ রাখতেন। কিন্তু সে শুধু হত নিখিলেশের মার দেহ রাখা। ছোটমার দেহ রাখা হত না!

সুধাময়ীর দিকে দৃষ্টি রেখে বলল প্রমিতা—হ্যাঁ, সব কিছুর পিছনে ওই লোকটি।

ফুল দিয়ে তখনও সাজাচ্ছিলেন ডাক্তার সুধাময়ীকে। কথাটা কানে যেতে এগিয়ে এসে বললেন—তোমার অংশও কম নয়। কি ভেবে আবার বললেন—তোমরাও এস, ছোটমা খুশিই হবেন।

যেমন ছিল এরা দু'জন, প্রমিতা-লী, তেমনি অবস্থায় নেমে এল রাস্তায়। নিখিলেশকে নিয়ে ডাক্তার সুধাময়ীকে কাঁধে তুলে নিলেন মণিকর্ণিকায় যাবার উদ্দেশ্যে। জনতা চলল সঙ্গে সঙ্গে।

যথা দিনে সুধাময়ীর শ্রাদ্ধাদি কাজ সুসম্পূর্ণ হল মধ্যাহ্নের মধ্যেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায় দেওয়া হয়েছে উল্লেখযোগ্য উপকরণের মাধ্যমে। সমাজ স্থানীয়দের সম্মান জানানো হয়েছে কাঞ্চন আর বস্ত্রদানে। নিমন্ত্রিতদের এখন আহার পর্ব সমাপ্ত প্রায়। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র সামাজিকতার খাতিরে নয়—সকলের অন্তরের দ্বারাই এ কথা স্বীকৃত, কাজটি ছোটমার উপযুক্ত কাজই হয়েছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যেই যে সমস্ত সুশৃঙ্খলে সম্পূর্ণ হল—সে শুধু ডাক্তারের বিলি ব্যবস্থা আর প্রতিমা-লীর অসাধারণ পরিশ্রমের হেতু! মোট কথা এত বড় কাজের কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়নি বলে সুস্থ হতে পেরেছে সকলেই, কিন্তু হতে পারেনি একা প্রমিতা।

ছোট মার শ্রাদ্ধ-দিনে যাঁর উপস্থিতি সন্দেহাতীত—তাঁরই অনুপস্থিতি প্রমিতার পক্ষে ভাবাও কষ্টকর। লজ্জাকরও বটে। প্রতিজনের একই প্রশ্ন—"ডাক্তারকে যে দেখছি না?" উত্তরে বলা একই কথা—"বলতে ত পাচ্ছি না"। সমস্ত দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মধ্যে প্রতি-মুহূর্তে উদাত্ত কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষা কাটিয়ে অপরাহ্ণ বেলায় অস্থিরতার বদলে প্রমিতার রক্তে যেন আগুনের তাপদাহ শুরু হল। শুধু কি প্রতীক্ষায় কাটিয়েছিল সারাটা দিন নিচেষ্টভাবে। পুষ্পদন্তেশ্বরে অন্তত লোক পাঠিয়েছিল বার দশেক। কিন্তু কেউ ত পারল না কোন খবর দিতে। তবে কী তাঁর বড়মার কিছু অসুখ নাকি? কিন্তু তিনি আছেন তার গুরুদেবের আশ্রমে। তবে?

আজকের দিনে ডাক্তারের না আসাটা লোকের চোখে একটা অনুপস্থিতিজনিত বিস্ময় জাগতে পারে। পারে হয় ত' জাগতে অভাব-বোধ। এ দুয়েরই অবসান আছে সাধারণের কাছে একটি কাল্পনিক অনুমানের মধ্যে, না-আসা অন্য কোন বিশেষ কাজে জড়িত হওয়ার দরুণ। এ অনুমান কাশীর আপামরের মনে জবাবদিহির কাজ করলেও এক জনের প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যাবে—এ অনুপস্থিতি কেন?

দিনে দিনে যে-সান্নিধ্য নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে দু'জনের কাছে, একজনের অপ্রকাশ্য বলতে আর কিছু নেই অপরের কাছে, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণ যখন দুজনেই দুজনের চোখে—সেখানে একজনের প্রাণ-সর্বস্ব মায়ের শ্রাদ্ধদিনে না আসাটা কী একজনের কাছে শুধুই অনুপস্থিতি ?

তাপ-দাহটা যেন বাড়ল আরো। অন্ধকার সিঁড়িতে বসে পড়ে দাঁতে-দাঁতে ঘর্ষণের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা স্বগোতোক্তি করল—এ অনুপস্থিতি নয়—এ হল আত্মগোপন। হ্যাঁ আত্মগোপনই। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারবশতঃ পালিয়ে থাকা—অব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ দিনে। যুগ-যুগমানা এমন পুণ্য জিনিষ ছোটমা বলেই কী ভাসিয়ে দেওয়া যায় ?

—দিদি ?

নরম হাতের স্পর্শে প্রমিতা যেন আত্ম-দহনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেল। নিঃশ্বাস ফেলে চাইতেই লী বলল—আমরা যে তোমার জন্যে বসে আছি ?

মনে পড়ল প্রমিতার নিখিলেশ এখনও অভুক্ত। কথা ছিল সবশেষে এক সঙ্গে বসা হবে জলযোগে।

আহারের মধ্যেই কথাটা তুলল নিখিলেশ—ডাক্তারের না আসাটা, সত্যি বলতে কি এখনও পর্যন্ত ভাবতে পাচ্ছি না।

প্রমিতা খাবার নামে ফলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মাথা নীচু করেই বসে রইল।

—এ দিকে আমার হয়েছে মুস্কিল—আবার বলল নিখিলেশ—তাঁকেই আমার ভীষণ দরকার—অথচ হাতে রয়েছে আজকের রাতটা শুধু! কি যে করি।

খবরটা আগেই শুনেছিল প্রমিতা, নিখিলেশ-লী কাল সকালেই চলে যাবে।

বলতে হয় বলেই যেন প্রমিতা বলল—দরকারটা কী ?

—প্রথম, মার নামে তাঁর হাসপাতালে কিছু দিয়ে যেতে চাই ?

আর দ্বিতীয়টা হল—এ বাড়ি আমরা ছেড়ে দেব। তিনি যেন বাড়িওয়ালাকে তাই বলে দেন। আর বলে দেন এ বাড়ির ভাড়াটেদের—

—এ কাজ কী আমায় দিয়ে হয় না? এবার মাথা তুলল প্রমিতা।

—তোমায় দিয়ে? এমনভাবে চাইল নিখিলেশ যেন কত বড় অসঙ্গত প্রস্তাবই না করছে প্রমিতা।

—তোমায় দিয়ে তা হবার নয়।

—আমি কি এতই অপদার্থ? একটু হাসল প্রমিতা। মুখে মুখে জবাব দেওয়া—শক্ত হল নিখিলেশের। একটু জল খেয়ে বলল—আমি যে কাজের কথা বললাম, তা করা সম্ভব এখানকার লোকের পক্ষে।

—দু বছরেও কি আমি তা এখন হইনি?

—হয়েছ বৈ কি, যথেষ্ট হয়েছ। সোৎসাহে এবার নিখিলেশ বলল—তার প্রমাণ ত অনেক পেলাম, কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—তুমি ত আর এখানে থাকছ না। চটপট এবার বলল নিখিলেশ।

থাকছ না! বাসুকী কী মাথা চাড়া দিল? দৃশ্যমান সব কিছুই যেন ঘুরছে প্রমিতার চোখের সামনে। শুষ্ক তালু থেকে একপ্রকার ভগ্নস্বর বেরিয়ে এল—তার মানে?

—আপনাকেও যে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। কোমল করুণ আবেদন পেশ করল লী।

কি শুনছে এ সব? শূন্য দৃষ্টি মেলে প্রমিতা চেয়ে রইল।

—মা যখন আর নেই—লীর আবেদনটা পরিষ্কার করে দিল নিখিলেশ—তখন এখানে তোমার আর কী করবার আছে বল?

অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে থেকে জানতে চাইল প্রমিতা—কোথায় কী করবার আছে তাহলে?

—কলকাতায়। লী আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল প্রমিতার কাছে।

—সেখানে? সেখানে কোথায়?

—আপনার ছেড়ে আসা বাড়িতে।

—আমার বাড়ি ?

—হ্যাঁ, তোমার হাতে সাজানো রেণী পার্কের বাড়িতে। নিখিলেশ তৎপর বলে উঠল।

পলকশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে এক সময় বলল প্রমিতা—সেখানে আমায় কী করতে হবে ?

—করতে হবে না কিছুই। বাঁ হাত দিয়ে প্রমিতার বাঁ হাত ধরে বলল লী—আপনি থাকবেন আমাদেরই মধ্যে—শুধু এইটুকু।

—শুধু এই ? বোধ করি একটু হাসল প্রমিতা।

—হ্যাঁ, শুধু এই। করুণ আকুতি প্রকাশ পেল লী-র গলায়।

—সতীন নিয়েও কোন কোন বউ আমাদের দেশে স্বামীঘর করে। কিন্তু সেখানে আমার কী পরিচয় হবে ? এবার সত্যিই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি চাপতে চাইল প্রমিতা।

—পরিচয় ত হয়েই গেছে দিদি।

লীয়ের কথার সূত্র ধরে নিখিলেশ এবার বলল—তুমি থাকবে সবার উপরে। আমাদের পরিচালনা করবে।

—ঠিক যেমন—ভূলুণ্ঠিতা পদদলিতা সর্পিণী যেন ফণা বিস্তার করল—ধনীর বাড়িতে মাইনে করা গভরনেস সম্পর্কশূন্য দুলাল-দুলালীদের লোক দেখানো পরিচালনা করে—ঠিক তেমনি না ?

লীর না জানা থাকতে পারে, কিন্তু আট বছর ঘর করা স্ত্রীর প্রকৃতি ত নিখিলেশের অজানা নয়। সানুনয় গলায় তাড়াতাড়ি বলল—তোমাকে কোন অনুরোধ করারও অধিকার আমার নেই—তা আমি জানি, কিন্তু যাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করেছ—তার অনুরোধটা রাখ ?

—কী সেটা ?

—তার দিদিকে নিজের কাছে রেখে দিদির দায়িত্ব নেওয়া।

—কিন্তু তার দিদি ত অনাথিনী নয়। ফল মিষ্টিভরা থালাটা প্রমিতা এক পাশে সরিয়ে রাখল।

প্রমিতার এ জবাবের কাছে নিখিলেশকে মাথা নত করতে হল। মুখ-হাত ধোবার জন্যে ঘর ছেড়ে বাইরে গেল কিন্তু এক আশ্চর্য উৎসাহ পেল লী।

প্রমিতার কথাটা ধরেই বলল—অনাথিনী? আমারও ঠিক ও কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন, যেদিন আমি জানলাম কিনা দখল করতে এসেছি তাকে, যার আট বছরের বিয়ে করা স্ত্রী ঘরে আছে। তাই সেদিন আবার দেশেই ফিরে যাচ্ছিলাম—এমন সময় হাতে এল মিউচুয়াল সেপারেশনের ব্যাকডেটেড দলিল। সেটা যে শুধু আমার জন্যেই তৈরী হয়েছিল—তা বুঝতে আমার দেরী হল না। শুধু দেশে ফিরে না গিয়ে এ দেশে কেন থেকে গেলাম?

কোন মন্ত্রবলে উদ্যত ফণা যেন চুপসে গেল -পর-নির্ভরশীলা, শান্ত, সংযতবাক যে মেয়েটি এ ক'দিন প্রমিতাকে ছায়ার মতন অনুসরণ করে আসছে—এই মুহূর্তে তারই যেন রূপান্তর ঘটল। প্রমিতার বিস্ময়-নিহিত দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল প্রখর বুদ্ধিদীপ্তা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বলা প্রাণপ্রাচুর্যময়ী এক নারী।

—কেন থেকে গেলাম। প্রমিতার চোখে চোখ রেখে বলল লী—আশ্চর্য ধরনের একজনকে দেখব বলে। জানেন ত, বিয়ে আর বিচ্ছেদ আমাদের জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে একটা—তার বেশী কিছুই নয়। বিয়েতে আলো জ্বললেও বিচ্ছেদে অন্ধকার ঘনায় না। ভালবাসা আর মর্যাদা ওদুটো জিনিষ ততদিন, যতদিন দুজনে একত্র। আবার তখনই শেষ যখনই একজন আর একজনের খেয়াল মেটাতে অক্ষম। কিন্তু অধিকাংশ শেষই দোষারোপের বিষে ভরা।

পাথরের গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে অবার বলল লী—কিন্তু এখানে এসে দেখলাম দোষারোপের বদলে সেলফ-অ্যাবনিগেশন। তা কী কখন সম্ভব হয় অনাথিনীর পক্ষে? সেই ঐশ্বর্যময়ীকে দেখব বলেই ভারতবর্ষে রয়ে গেলাম। এখন আমাদের মধ্যে আপনার থাকা সেটা আপনারি ইচ্ছে।

লীর বক্তব্য প্রমিতাকে কিছুটা অভিভূত করলেও তার সংস্কারের

তারে যেন আঘাত হানল। তার জন্যেই শুধু ভারতবর্ষে থেকে যাওয়া? কথার মধ্যে প্রচুর মাদকতা থাকা সত্ত্বেও এতটুকু নেশাচ্ছন্ন হল না প্রমিতা। মনে হল তার, একজনকে উজ্জ্বল করার প্রচেষ্টায় আর একজনকে নিষ্প্রভ করা হল। প্রতিবাদ না করে পারল না প্রমিতা —কিন্তু স্বামীর ভালবাসা? তার কী কোন দাম নেই তোমার কাছে?

—নিশ্চয়ই আছে। সুমধুর স্বরে বলল লী—ওটাই ত ভারতে আসার আমার পাসপোর্ট। কিন্তু আপনি ত কিছুই খেলেন না?

—খেয়েছি বৈকি।

—না খাননি। আমাদের সঙ্গে বসেছেন বটে কিন্তু কিছুই খাননি। কেন খাননি তা জানি। একটু থেমে নতনেত্রে বলল লী—আমরা যে অতিথি।

প্রমিতা কিছুই মুখে দেয়নি তা ঠিক। শারীরিক ক্লান্তি আর মানসিক অবসাদ হেতু এই না খাওয়াটা—আর একজনের কাছে অনাত্মীয়তার কারণে দেখা দেবে, ভাবতেই পারেনি প্রমিতা। করুণ কণ্ঠের এই চাপা অভিমানের কাছে প্রমিতার সমস্ত গ্লানি যেন মিলিয়ে গেল। নিজেকে অপরাধিনী মনে করে ব্যাথাতুর গলায় বলল—বোন কী কখনও অতিথি হয়? এই ত খাচ্ছি। থালা থেকে একটা আপেলের টুকরো মুখে দিল।

ঘরে এল নিখিলেশ। প্রস্তাবটা যেন ঝালিয়ে নেবার জন্যেই বলল—তাহলে আমাদের মধ্যে তোমায় পাচ্ছি ত?

যে শক্তির জোরে এই একটু আগেও স্বামী-স্ত্রীর মিলিত প্রস্তাবটা প্রমিতা উপেক্ষা করেছিল—তার যেন বিলুপ্তি ঘটেছে এখন। এ যেন অস্ত্রহীন অবস্থায় শত্রুর সামনে পড়া। হয় অধীনতা স্বীকার, নয় অবধারিত মৃত্যু। মুখের ফল মুখেই আটকে গেল। ভিক্ষার্থীনীর চোখে চাইল প্রমিতা লীয়ের দিকে—যদি রেহাই পায় এ যাত্রায়।

দেখল স্বামীর প্রস্তাবের প্রতিরূপে ভরা স্ত্রীর চোখমুখে একই অভিব্যক্তি। পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকার শক্তি প্রমিতা এবার নিজেই নিজের মধ্যে হাতড়াতে লাগল মাথা নত করে।

এ মৌনতা যে আর কিছুই নয় —প্রস্তাবেরই স্বীকৃতি এতক্ষণে তা স্পষ্ট হল। সদীপ্ত গলায় বলল নিখিলেশ—এবার ওঠ লী, আয়াকে বল সব ঠিক করে নিতে। আজকের রাতটাই ত সময়। ভাল কথা, প্রমিতা, তুমি বাড়িওয়ালাকে এখনই একটা বাড়ি ছাড়ার নোটিশ পাঠিয়ে দাও। লী, আমার কলম প্যাডটা—

—না।

দমকা হাওয়ায় রাজ্যের ধুলোবালি এসে নিখিলেশের দৃষ্টিশক্তি যেন আচ্ছন্ন করল। একটি কথার আঘাতে চমকে উঠে লী দেখল, তার দিদি মাথা তুলে বসে আছে উদ্যত ভঙ্গিতে।

এক সময় থালাটা সরিয়ে উঠতে যাবে প্রমিতা, কানে এল লীর কণ্ঠস্বর—যাওয়া কি একান্তই সম্ভব নয়?

—না। এবার গলার স্বরটা কোমল পর্দায় নামিয়ে বলল প্রমিতা —তুমি হয়ত ভাবছ, এটা আমার অবজ্ঞা। তোমার কথায় বলি তাহলে, যে আশ্চর্য ধরনের লোককে দেখবার জন্যে তুমি এ দেশে রয়ে গেলে—তাকে দূরেই রাখলি। রোজের ব্যবহারে তোমার চোখে সে মোহ আর না থাকতেও পারে? তাছাড়া কাশী ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

—সম্ভব নয়? নিখিলেশের-অত্যাশ্চর্য মুখের দিকে চেয়ে প্রমিতা হাসল—তুমিই ত বল্লে কাশীর বাঙ্গালীটোলার আমি নাকি পরম-আত্মীয়। হ্যাঁ, আত্মীয় সত্যিই ছিলেন মা—আমি ছায়া শুধু।

—সেই কথাই ত ভাবছি—বাস্তব অবস্থাটা তুলে ধরতে চাইল নিখিলেশ—মা যখন নেই তখন আর এখানে তোমার কী প্রয়োজন বল?

—সেই জন্যেই ত আরো প্রয়োজন।

—একটু খুলে যদি বল? নিখিলেশ আবার বসল নিজের জায়গায়।

আবার প্রমিতা যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ বাদে স্থির গলায় বলল—দিন যে শেষ হয়ে আসছে, মা ত বুঝতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই, মা আমাকে এইখানে, এই

কাশীতেই স্থিতি করতে চেয়েছিলেন। এই চাওয়ার মূলে, আমার বিশ্বাস, ছিল দুটো কারণ। প্রথম হল এই আট বছর ধরে তাঁকে আশ্রয় করে যারা আছে—তাঁর অভাবে তারা যেন অনাথ না হয়। আমার কাশী ছাড়া মানেই বুঝতে পাচ্ছো—মা যে লোকেই থাকুন না কেন, তাহলে তিনি সুখী হবেন না নিশ্চয়।

প্রমিতার আত্মবিশ্বাস নিখিলেশ-লীকে যেন কিছুটা অভিভূত করল বলে মনে হল। মনে হল, আলোচনার যেন এখানেই শেষ। হঠাৎ নিখিলেশ প্রশ্ন করে বসল—দ্বিতীয় কারণটা?

—মার মৃত্যুর সঙ্গেই তা শেষ হয়ে গেছে? আস্তে আস্তে বলল প্রমিতা—এবার আমরা উঠি না কেন?

—তাহলে কী তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে?

নিখিলেশের প্রশ্নে হাসল প্রমিতা—বলতে পার তা।

—যা শেষ হয়ে গেছে তা কী আমরা জানতেও পারব না?

লীর এই আবেগ-আকুল প্রার্থনার কাছে প্রমিতার অন্তর্দুর্গের আগল ভেঙ্গে পড়ল যেন।

কালীঘাটের বাড়িতে প্রথম দেখা থেকে এই সেদিন ধরমশালায় আহত অবস্থায় দেখা এক অনন্য অধ্যায়। ক্ষণগভীর অথচ বিচ্ছিন্ন, বিরহদহন ক্লিষ্ট অথচ সাহচর্যে স্নিগ্ধ। বিড়ম্বিত অধ্যায়ের যে নায়ক সে ত মদ্যপ, মার মৃত্যুর দায়ভাগী। জীবন পাবার বিনিময়ে বিদেশিনীর দান নেবাব পরিবর্তে আত্মপীড়নের সে কি সহজ সরল স্বীকারোক্তি জনসমাজে। আয়ত্তাধীন প্রেয়সীকে স্বামীভাগ্যবতী করার প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধন। বলা শক্ত কেন এই মুহূর্তে আত্মসচেতন প্রমিতা হৃদয়গভীরে এক তীব্রতম তাগিদ অনুভব করল সেই অতীতকে তুলে ধরার, তার প্রাক্তন স্বামী আর তারই স্ত্রীর সামনে।

এই তুলে ধরার তাগিদেই আবহমানকাল ধরে সৃষ্টি হয়ে চলেছে কত কাব্য, নাটক, সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য কোথাও ভুক্তভোগী স্বয়ং প্রবক্তা কোথাও মরমী শিল্পীর হৃদয়রসে প্রকাশিত।

—ভালবাসতাম। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার-আকাশের

দিকে দৃষ্টি রেখে বলল প্রমিতা—ভালবাসব বলেই ভালবাসতাম—তাতে না ছিল গুণবিচার, না ছিল ভবিষ্যৎ গড়ার মন ভোলান ছবি। কালীঘাটের বাড়িতে—ও, তুমি ত আবার বুঝতে পারবে না?

—মেয়ে হয়েও পারব না? হাসল লী—প্রাকবিবাহের ঘটনা ত?

লীকে দেখে প্রমিতা বলল আবার—থাকত আমার পেছনে পেছনে। সামনে এসে কোন কিছু চাওয়া ত দূরের কথা—আমার সান্নিধ্যেই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। বুঝতেই পাচ্ছো তাহলে, তার ভালবাসাটা। ভাগ্যদোষে সমাজ চিহ্নিত ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারেনি ঠিকই—কিন্তু নিজের পরিচয়ের হুঁসটা হারায়নি কোনদিনই। বৈমাত্র ভাইয়েদের বাড়িতে অনাদরে পড়ে থাকা অসহায় একটা কুমারীর দেহমাংস নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি না করে, বরঞ্চ সেই মেয়েকে স্বামী সৌভাগ্যবতী হবার রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায় সব ছেড়ে।

—আশ্চর্য! তোমাকে দেখে ত আমার কোনদিনই—নিখিলেশকে শেষ করতে না দিয়েই বলল প্রমিতা—মনে হবে কী করে? আমাকে সুখী করাই যদি তার বাড়ি ত্যাগের কারণ হয়, তা'হলে আমার ত-তাই হওয়াই ধর্ম।

—তারপর দিদি?

—আট বছর পর দেখা। ওই দেখাই শুধু। একটা মেয়ে দেখলে তার প্রাক্তন প্রেমিককে—আর প্রেমিকও দেখলে তাই। কিন্তু মা কি দেখলেন মা-ই জানেন। ইচ্ছে প্রকাশ করলেন আমাদের বিয়েটা—এই কাশীতেই দিয়ে তবে যাবেন। তাই কাশী কি আমি ছাড়তে পারি? এটাই হল দ্বিতীয় কারণ?

—বিয়েটা হচ্ছে কবে? অধীর আনন্দে জানতে চাইল লী।

—কৈ আর হচ্ছে?

—কেন? প্রশ্ন করল নিখিলেশ কৌতুক কণ্ঠে।

—তিনি বুঝি এখন বিবাহিত?

—যাকে বলে সন্ন্যাসী। লীয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে একটু হাসল প্রমিতা।

—তবে ?

—তবে ? বিধিবাম ।

—তিনি কী অসম্মত ?

—সে প্রশ্নই ওঠেনি, তোমায় বলব কি করে লী ?

—আপনার বর্তমান অবস্থা তিনি কী জেনেছেন ?

—জেনেছেন বৈকি ।

বড় দুর্বোধ্য লাগল লীয়ের। দৈবাৎ আংটি খুলে গেলেও, আঙুল যদি ঠিক থাকে, অনুকূল পরিবেশে সে আংটির পুনঃযুক্ত হওয়াই ত জৈবধর্ম। যা অদৃশ্য—যা আয়ত্তের বাইরে তাকে পাবার প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়—বিধিবাম বলা আত্ম-তুষ্টির একটা কৈফিয়ৎ হতে পারে হয়ত। কিন্তু জানালা দুয়ার বন্ধ রেখে প্রকৃতির দান সূর্যের আলো হাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা সুস্থতার পরিচয় নয়। তবে নিশ্চয় এ পক্ষ সম্মত নয়।

—তবে কী আপনারই ইচ্ছে নেই ?

হাসিতে হাসিতে ঘরটা ভরিয়ে দিল প্রমিতা।

—আমি কি এতই বুড়ি হয়ে গেছি ?

নিদারুণ পরিশ্রমশীর্ণ আজকের যে রূপ, সে ত শুধু একটি ফুঁয়ের অভাবে। ছাই অপসারণের সঙ্গে যে জ্যোতি দেখা দেবে সে দেখা ত লীয়ের হয়ে গেছে কাশীতে আসার দিনই।

—বুড়ি ? আমার দেশ হলে আজও আপনাকে কুমারী বলেই সকলে ভাবত। তাই ত আশ্চর্য হচ্ছি, কেন হল না ?

—বললাম যে বিধিবাম। এখন চল হাত ধুয়ে আসি ?

—ও কথাটার অর্থ এ দেশে কি জানি না। প্রমিতার ডাক উপেক্ষা করেই বলল লী, কিন্তু এটা জানি, আমাদের স্বর্গীয় মায়ের ইচ্ছাটা আপনার রাখাই উচিত ছিল দিদি।

হাস্যোজ্জ্বল প্রমিতার মুখে এখনি কে যেন কালি ঢেলে দিল। থরথরিয়ে একবার কেঁপে উঠেই নিথর হয়ে গেল। এমন জ্বলন্ত শিখার আকস্মিক ক্ষয় প্রাপ্তিটা স্বামী-স্ত্রীকে ভাবিয়ে তুলল। বর্তমান

স্ত্রীর দ্বারা প্রাক্তন স্ত্রীর ত্রুটি উদ্‌ঘাটনটাই যে অগ্নির অঙ্গার হবার কারণ—সেটাই অনুমান করে লীয়ের অপরাধের ক্ষমা চাইল নিখিলেশ অনুতপ্তভাবে—আমি কী এ ব্যাপারে কিছু করতে পারি না প্রমিতা ?

ঔচিত্য-কথাটা বলায় পরিচয়ের সীমারেখা যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বুদ্ধিমতী লী তখনই তা উপলব্ধি করেই স্বামীর সুরে সুর মেলাল—আমিও কি কিছু পারি না ?

—হলে আপনিই হত, কারুরই সাহায্যের দরকার হত না। কথাটা বলে লীয়ের দিকে চাইতেই প্রমিতার মুখে এক ঝলক রক্ত এসে দানা বাঁধল। স্বচ্ছ গলায় বলল—উচিত ছিল ? তুমি ঠিকই বলেছ, লী। তবে ঘটনাটা জেনে রাখ, শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মা যাকে সুখী করতে চেয়েছিলেন—সেই প্রাক্তন পুত্রবধূর শঙ্করকে ছেড়ে আসার কারণটাই হয়ত শাশুড়ির আশু মৃত্যুর কারণ। সেই কারণেই কাশীর মাটি কামড়ে আমায় থাকতে হবে। প্রতিদিন সকালসন্ধ্যে এই বাড়ির এই ঘরে ওই ছবির উদ্দেশ্যে আমায় আমরণ বলতে হবে, শঙ্করকে বিয়ে না করেও আমি সুখী হয়েছি মা। মাথা নীচু করে আঁচলটা মুখে চেপে ধরল প্রমিতা।

স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি বিনিময় হল। গোপন আলোচনার মাধ্যমে এরা দুজন যে প্রদীপটা জ্বেলে একজনের জীবনের অন্ধকার অপসারণ করে নিজেদের কাছে নিজেরা কিছু জবাবদিহি করতে চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত দমকা হাওয়ার দাপটে নিজেরাই যেন শ্বাসরুদ্ধ হল। এই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ বোধ হয় একটি শুধু—তা হল প্রদীপ জ্বালবার ইচ্ছেটা একেবারে জলাঞ্জলি দেওয়া !

—কিছু না জেনেই—অনুতপ্ত গলায় বলল নিখিলেশ—আমাদের মধ্যে তোমায় পেতে চেয়েছিলাম। পেলাম ত নাই—মাঝ থেকে তোমায় কষ্ট দিলাম। আমাদের ক্ষমা কোর !—কালই আমরা চলে যাচ্ছি—যাবার আগে পুরানো ভিক্ষেটা আবার স্মরণ করাতে চাই শুধু ?

আঁচলটা সরিয়ে মুখ তুলল প্রমিতা।

—মাকে আশ্রয় করে যারা এতদিন ছিল, তারা যেন তেমনি থাকে—শুধু আমাদের এই ভিক্ষে—

—তুমি টাকার কথা বলছো ত? উদগ্রীব হয়ে উঠল প্রমিতা।

—যদি ভরসা দাও?

—নিশ্চয় পাঠাবে। নিখিলেশের চোখে চোখ রেখে বলল প্রমিতা—মৃত্যুতেই যে মানুষের সব শেষ নয়, তা যদি বিশ্বাস করো, টাকাটা যেমন পাঠাচ্ছিলে তেমনিই পাঠিও?—দাঁড়াও চায়ের কথা বলে আসি।

আনন্দিকে চায়ের কথা বলে ফিরে আসতেই প্রমিতার হাতটা লী ধরল। —দিদি?

—তোমার আবার কী আদেশ?

—একটা অনুরোধ?

—ছি, আবদার বল?

—আপনাকে মনে রাখবার মতন অনেক কিছু আমার হাতে আছে। আমাকে মনে রাখবার মতন কিছু যে আপনাকে দিতে চাই?

যে মেয়ে হাত ধরে দাঁড়িয়ে প্রমিতা যেন কখনো দেখেনি তাকে। শুধু চেয়ে রইল না, এতদিন আত্মম্ভরিতার পাঁচিলে ঘেরা স্বাতন্ত্র্যতা অক্ষুণ্ণ রেখে মাথা তুলে চলাই ছিল যার স্বভাব—সে এখন নতশির ওই কোমল কণ্ঠের করুণ আবেদনের কাছে। অপ্রয়োজনের অজুহাতে "চাই না কিছুই" বলা শক্ত হল প্রমিতার। দ্বিধান্বিত চিত্তে শুধু চেয়েই রইল। পাশের ঘরে বাচ্চাটির কান্না শুনে লী-কে যেতে হল প্রমিতার হাতটা ছেড়ে। সন্তানকে কোলে নিয়ে লী আবার এল এ ঘরে।

—দিদি?

—বল?

—আমার আব্দারটা?

শিশুটিকে দেখেই প্রমিতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সহজ গলায় বলল—তোমার দেওয়া ত আগেই হয়ে গেছে লী!

—দিয়েছি? লীয়ের পায়ের মাটি যেন কাঁপছে।

—দিয়েছ বৈকি! লীয়ের কোল থেকে তার সন্তানটিকে নিজের কোলে নিয়ে সুধাস্নিগ্ধ গলায় বলল প্রমিতা—এই ত দিয়েছ। আমি আট বছরের মধ্যে যা দিতে পারিনি।

তারপর শিশুর গালে গাল রেখে বসেই রইল প্রমিতা।

আজ সারা সকালটা দম ফেলবার মত এতটুকু সময় পায়নি প্রমিতা। ঘুম থেকে উঠেই লিখিলেশ লী-র কলকাতায় যাবার ব্যাপারে সাধ্যমত সাহায্য করতে হয়েছে। কিছুটা ত্যাগও স্বীকার করতে হল। শ্বশুরের ছবিটা সুধাময়ীর প্যাঁটরায় বন্দি হয়েছিল। কাশীতে আসার দিন থেকে সযত্নে প্রমিতা নিজের শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও লীয়ের অনুরোধে দিয়ে দিতে হল। সারা দুপুরটা গেছে শ্বাশুড়ির শ্রাদ্ধের দরুন পাঁচ বাড়ি থেকে আনা বাসনপত্র যথা জায়গায় ফেরত পাঠান, বাড়তি মিষ্টিগুলো কেদার-ঘাটের দরিদ্রনারায়ণদের দিয়ে আসা, পাওনাদারদের হিসেব চুকিয়ে নিচের তলার এক হাঁটু ময়লা পরিষ্কার করতে। এরপর স্নান সেরে প্রমিতা যখন ওপরে এল তখন পড়ন্ত বেলা।

প্রমিতার চোখে পড়ল বারান্দার এক কোণে রাখা কেদার মন্দিরের পুরোহিতের দান। বৃদ্ধ অসুস্থ তাই আসতে পারেনি গতকাল। অবসন্ন প্রমিতা আনন্দির হাত দিয়ে তা পাঠিয়ে দিতে গিয়েই মনে পড়ল পুষ্পদন্তেশ্বরে ডাক্তারের খবর নেবার কথা বলায় আনন্দিকে না হয় প্রমিতা ধমকই দিয়েছিল, তাই বলে এই! সারা সকালটা গা ঢাকা দেওয়া! হতচ্ছাড়ি!

চাদরটা গায়ে টেনে দানটা নিয়ে প্রমিতা চলে এল রাস্তায়। এখন সন্ধ্যারতির সময়। পরিচিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল চলেছে গঙ্গার ঘাটে। আজ এমনি অবস্থা প্রমিতার কারুর সঙ্গে যে দুটো কথা কইবে সেটুকু সামর্থ্যও নেই।

পুরোহিতের হাতে দানটা দিতেই প্রমিতা যেন নিজেই কেঁপে উঠল। এমন আন্তরিক কান্না কই এমন ত কাউকে দেখেনি প্রমিতা কাঁদতে। মৃত কন্যার জন্যে ঠিক যেন পিতার মর্মান্তিক দুঃখ।

এইত মাত্র গতকালের ঘটনা। শাশুড়ির শ্রাদ্ধের দান গ্রহণের মধ্যে কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে যে-ভাব প্রকাশ পেয়েছিল তা যেন মৃতাকে বাধিত করছেন তাঁরা—এমনি একটা উদ্ধত ভঙ্গি।

পুরোহিতের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দু' একটা সান্ত্বনার কথা কয়ে উঠে পড়ল প্রমিতা।

চলেই আসছিল কিন্তু তা কি সম্ভব! এ যে শাশুড়ির বিলিব্যবস্থা। অর্থাৎ গড়েন ঘাটের সেই প্রাণীগুলো ইতিমধ্যে ঘিরে ধরেছে প্রমিতাকে, শাশুড়ির মতই শুকলালের দোকানের মিষ্টি ধরে দিতে হল।

এইবার বাড়ি, দু'পা এগুলেই বাঁহাতি গলি। নির্জীব দেহটাকে কোনভাবে টেনে এনে বাড়ির দুয়ারে আসতেই প্রমিতার চোখের সামনে সারা পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল।

নগ্ন পদ, পরণে কোরা থান, কাঁধে কোরা চাদর, রুক্ষ চুল কানের দুপাশ বেয়ে নেমে এসেছে বুক বরাবর। এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণ যোগী যেন এই মাত্র তার যোগাসন থেকে উঠে এলেন।

—বড়মা। স্বভাবসিদ্ধ গলায় বললেন ডাক্তার—গতকাল ভোরে।

প্রমিতা বাড়ির কপাট ধরে কোন রকমে দাঁড়াল।

—"এবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিছানা নিয়েছিলেন—আর উঠলো না।" একটু থেমে আবার বললেন ডাক্তার—আমার কোন সেবাই নিলেন না—না পারলাম এক ফোঁটা ওষুধ দিতে, না পারলাম—

কাঁধের চাদরটা চোখের সামনে ধরলেন ডাক্তার।

ডাক্তারের বেদনা—এই মুহূর্তে প্রমিতার মনে পড়ল বড়মার জীবন-ভোর সাধনার কথা—"আমাকে ডাক্তার করে তোমার মধ্যে মার একমাত্র উদ্দেশ্য হল সমাজ পরিত্যক্তারা যেন মরবার আগে একটু চিকিৎসা পায়।"

ডাক্তারের বেদনা আস্তে আস্তে প্রমিতার মধ্যে যেন সংক্রামিত

হচ্ছে। কিন্তু প্রমিতা তখনি তা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক্তারের হাত ধরে বাড়ির ভেতরে এসে চেয়ারের অভাবে তাকে সিঁড়ির ধাপে বসিয়ে দিয়ে বলল—নিজের যাবার সময় ওষুধ পাব চিকিৎসা হবে এই স্বার্থে বড়মা ত তাঁর ছেলেকে ডাক্তার করাননি। মা-ত আরো অনেক আছে। ছেলের আবার দুঃখ কেন?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে এক সময় বললেন ডাক্তার—ওইটুকুই আমার সান্ত্বনা আরও সান্ত্বনা মার মুখাগ্নি করতে পেরেছি।

শোনা মাত্রই প্রমিতা বসে পড়ল ঠিক ডাক্তারের পাশেই। একী দুর্জয় পদক্ষেপ। বড়মা! সে ত শুধু একটাই লোকের কাছে। কাশীর সমাজে বাঈজী বই তো অপর কিছুই নয়। ডাক্তারের বাবার শেষ পরিণতিটা যেন স্বচক্ষে দেখছে প্রমিতা। মৃতদেহের প্রতি জঘন্য অপমান বাঈজী বাড়িতে পুরুতগিরি করায়। সেই ললিতা বাঈয়ের মুখাগ্নি? তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনায় অশৌচ পালন! ডাক্তারের কপালে কি আছে কে জানে? প্রমিতা যেন ভেতরে ভেতরে কাঁপছে।

—প্রমিতা। ডাক্তার তখনি যেন প্রমিতার চিত্ত উদ্বেগটা উপলব্ধি করলেন—একদিন তুমিই কথায় কথায় বলেছিলে বড়মাকে আমার বাড়িতে রেখে তাঁর ত্যাগের মহত্বটা দেখাতে এই বাঙালীটোলার লোক-দের। ছোটমার মতই বড়মার শবযাত্রায় অনেকেই অংশ নিয়েছিল।

আঁতকে উঠল প্রমিতা—নিয়েছিল?

—নিতে যে বাধ্য। সত্য যে এই ভাবেই তার পথ করে নেয়।

শোনামাত্রই প্রমিতা যতটা উৎফুল্ল হল, ঠিক ততটাই যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল—লজ্জায় আর অনুতাপে। বড়মার বাড়িতে বসে তাঁর দেওয়া মিষ্টি সেই কিনা একদিন প্রত্যাখান করেছিল ঘৃণায়! বড়মা অভাবে একবার তার মনে হল এই অশৌচ ব্রতধারি প্রাণপ্রিয় সন্তানটির পা ধরে ক্ষমা চাইতে।

বড়মার হঠাৎ মৃত্যুজনিত একের পর এক কাজের মধ্যে দুটো দিন ডাক্তার যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। গতকাল সুধাময়ীর শ্রাদ্ধের চিহ্ন এ বাড়িতে এখনও এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চোখে

পড়া মাত্রই একটা তীব্র হাহাকার এই বাস্তববাদী সংসারের বহু ব্যথা-বেদনার নির্লিপ্ত সাক্ষীকে নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে কে যেন টেনে আনল এই মুহূর্তে। একজনের শ্রাদ্ধের দিনে আর একজনের অন্তর্ধান। এক জন ত ছিল কাত্যায়নী শক্তি অপর জন জীবনে বাঁচার অর্থ। এই বাঁচার অর্থ আয়ত্ত করার শক্তি আর কেউ না জানুক, নিজের পুরুষাকারে নয়—মূল উৎস সে ওই নারী। শিশুসুলভ অভিমানে ডাক্তার কাঁদছেন এখন।

—একজন না হয় গেলেন কিন্তু অন্যটি যদি আর কিছুদিন থাকতেন, তাঁকে ধরে অভাবটা ভুলতে পারতাম। বুড়ো ছেলেটাকে যথার্থ মা-হারা করবে বলে ছ্ মায়ের কি নিষ্ঠুর কৌশলটা একবার দেখেছ, প্রমিতা! একজনের শ্রাদ্ধের দিনে আর একজনের পালিয়ে যাওয়া! ভাল! এই যদি মায়ের কাজ হয়, ভাল! চোখের জলটা রোধ করবেন—সেটুকু সামর্থ্য ডাক্তার হারিয়েছেন।

প্রাণবন্ত লোকটির এমন সর্বহারা মূর্তি চেয়ে দেখা প্রমিতার পক্ষে ত অসম্ভব। কোথায় ডাক্তারকে সান্ত্বনা দেবে, নিজেই কেঁদে আকুল।

আবহাওয়াটা বদলের জন্যে এক সময় টেনে টেনে প্রমিতা জানাল—আজ সকালে নিখিলেশ-লী চলে গেছে—যাবার সময় ডাক্তারকে বড় আশা করেছিল। কি যেন তাদের বলার ছিল।

আসা ত আমার উচিত ছিল; কিছুটা সামলে বললেন ডাক্তার—কিন্তু সময় পেলাম কৈ?

—আজও বুঝি বড়মার বাড়িতে যেতে হয়েছিল?

—শুধু সেখানে কেন! সেখান থেকে রুক্মিণীকে নিয়ে মার গুরুদেবের বাসায় তারপর আদালত, আর এখন এই ত সটান তোমার কাছে?

—আদালতে? জলভরা চোখে প্রমিতা যেন চমকে উঠল।

আজ রাতে যে গুরুদেব হরিদ্বারে তাঁর আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন—এদিকে সাক্ষীর দরকার। তিনি যে একমাত্র সাক্ষী হলেন।

বড়মার মৃত্যুর পরেই আদালতে সাক্ষী—বড় দুর্বোধ্য ঠেকল প্রমিতার

কাছে, ডাক্তারের মুখের দিকে চোখ তুলতেই তিনি প্রমিতার বিস্ময়টা বুঝতে পেরেই বললেন তিনি,

—তোমার মনে আছে কিনা জানি না, রাজঘাটের বাড়িতে গুরুদেব আমায় একটা দলিল দেন—ওটাই হল আমার নামে বড়মার দানপত্তর, স্থাবর-অস্থাবর অর্থাৎ বাড়িটা পর্যন্ত। মা বোধ হয় ভেবেছিলেন বাড়িটা আমায় দিলে পথ থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়েটা মানে রুক্মিণীর একটা ঠাঁই থাকবে বলেই কিন্তু ডাক্তার হঠাৎ যেন তলিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে।

—নিশ্চয়ই থাকবে। প্রমিতা ডাক্তারের হাতটা ধরে তার সম্বিত আনবার চেষ্টা করল।

—থাকবে? হাসি দেখা দিল ডাক্তারের ওষ্ঠে—দু মায়ের আদর্শ যে রক্তে আমার? পারব কেন বাড়িটা সামলাতে? অভাব তাড়নার মুখে কোন দিন হয়ত বাড়িটাই বেচে দিতাম। তাই আজই গুরুদেবকে সাক্ষী রেখে ওটা রুক্মিণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম—দুটো জিনিষ ত হারান যায় না, একটা অন্তত মেয়েটার থাকে।

শেষ কথাগুলো যে প্রমিতার কাছে পরিস্কার হল না তা বুঝেই ডাক্তার আবার বললেন—তোমায় বলব বলব করে আর বলা হয়নি। রুক্মিণী আমায় ভারি ভালবাসে প্রমিতা—সেই এতটুকু বয়স থেকে। সেবার মার রক্ত কলেরার সময় যেদিন খুব বাড়াবাড়ি, ওকে আমি পাই না, অথচ দরকার ভীষণ, এটা ওটা হাতের কাছে এগিয়ে আনে। সেই অবস্থায় মাকে ফেলে রেখে রুক্মিণীকে খুঁজতে গিয়ে দেখি ঠাকুর ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদছে! ঠিক কান্না নয় যেন কার কাছে বুকফাটা আর্তনাদ জানাচ্ছে। মা ওদিকে যায় যায়, মেয়েটার এই অবস্থা। তখনি বুকের কাছে টেনে এনে বললাম—কাঁদছ কেন? মা গেলেও তুমি নিরাশ্রয় হবে না—এই ত আমি রয়েছি তোমার সাথী —আরে কী, আরে কী হল?

—তা বটে, তা বটে—যে শুনবে সেই তোমার মতন চমকাবে। হাসলেন ডাক্তার।

এই সেই হাসি ছোটমার তামাশার মতন; বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল একবার।

ডাক্তারের হঠাৎ এমন হাসিটা প্রমিতার কিন্তু ব্যঙ্গ বলেই মনে হল। শুচিতা, শালীনতা, ন্যায়নীতির বিপক্ষে শুধু প্রতিবাদই নয় একটা তীব্র অবজ্ঞা। এই বয়সে ডাক্তারের স্বেচ্ছাকৃত এই অধঃপতন, প্রমিতা যদি নিজের মুখেও বলে বেড়ায় কাশীর আপামরের কাছে তবু তা হবে অবিশ্বাস্য। আর এই বিশ্বাসের মূল্যটা কিনা দুপায়ে দলে যাওয়া, প্রমিতা ইচ্ছে করে পানপাত্রটা টেনে না নিয়ে তাতে আরো বিষ ঢেলে দিল, বলল—ভাল কথা, তা চার হাত এক হচ্ছে কবে?

—কৈ আর হল। ডাক্তারের গলায় বিষণ্ণতার সুর।

—কারণ?

—কারণ রুক্মিণীর আপত্তি।

এইবার প্রমিতাই যেন নিজের মনে হেসে উঠল একচোট। যে শ্রেণীর মেয়েরা নিত্য-নতুন ভোগের মধ্যে নিজেদের ভরিয়ে রেখে বিয়ের মত স্বর্গীয় জিনিষকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়—তাদের কাছে গাঁটছড়া ত ফাঁসির দড়ি। ডাক্তারের এ হেন আহম্মকি দেখে প্রমিতার মনে হল সাত সাগর পেরিয়ে আসা এক দক্ষ নাবিকের ডোবায় সলিল সমাধি হল। শুধু তাই নয় দিনে দিনে ডাক্তার কাশীর সমাজে নিজের ভাবমূর্তিটা নিজেই হত্যা করল। ডাক্তারের অমন ব্যঙ্গ হাসিটার শোধ তুলল প্রমিতা—তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে সব কিছু অবজ্ঞা করা যেত যদি আসলে সত্য বলে কিছু থাকত।

—মানে? চোখ থেকে চশমাটা খুলে যেন প্রমিতাকে স্পষ্ট দেখতে চাইলেন ডাক্তার।

মানে মন্দিরের বাইরের চাকচিক্য দেখে যে-ভক্ত ভক্তিতে গলে যায় দেবতাকেও পায় না উপরন্তু নিজেকেও ঠকায়।

একভাবে প্রমিতার দিকে চেয়ে রইলেন ডাক্তার।

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন—বড় ভাল কথা বলেছ। বন্ধু,

দেবতাকে পায় না। কিন্তু আমাদের বিয়ে না হওয়াটা যে একটু অন্য রকমের।

—কী রকম ?

—আমায় বিয়ে করতে রুক্মিণীর আপত্তিটা আর কিছু নয়। বাঈজী বাড়ির পুরুতগিরি করায় আমার বাবা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। পথে পাওয়া বাবা-মা-পরিচয়হীন মেয়েকে বিয়ে করলে আমারও নাকি সেই দশা হবে—সেই লজ্জায় রুক্মিণী আমায় বিয়ে করতে রাজি হল না—এক রকম স্বইচ্ছায় তপস্বিনী এই আর কি !

পাথর বাঁধান সিঁড়িতে বসেও প্রমিতা এখন যেন আর নিজেকে সামলাতে পারছে না—কোন অতল গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে। সিঁড়ির রেলিংটা ধরে কোন রকমে ধাতস্থ হল। হওয়া মাত্রই শুচিশুভ্রা এক যুবতীর আন্তরিক আহ্বান কানে বাজল—"সময় পেলে, আবার আসবেন।" ধরা গলায় এক সময় প্রমিতাকে বলতে শোনা গেল—মার দুটো সাধ ছিল। একটাকে ত নিজেই ঘুচিয়ে এসেছি, অন্যটা অন্ততঃ রাখি। ডাক্তার কালই তুমি রুক্মিণীকে এ বাড়িতে নিয়ে এস ?

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—আঃ, বাঁচালে প্রমিতা। এই দুটো দিন ভেবে মরছি বয়েসের মেয়েটাকে ওই পাড়ায় রাখি কী করে ? সত্যি বাঁচালে। বড়মার শ্রাদ্ধটুকু গেলেই নিয়ে আসব। আনন্দির মতই থাকবে—কি বল প্রমিতা ?

—না ! প্রমিতার প্রচণ্ড ধমকে ডাক্তার চমকে উঠলেন।

—আনন্দির মত নয় ! ধীর স্বরে বলল প্রমিতা—আনন্দির দিদি-মণির মতন থাকবে।

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে ডাক্তার বললেন—ছোটমার হাতে গড়া বৌ যে সে ত এই কথাই বলবে। তা হলে আজ আসি ?

—সেকি ! ওপরে চল—আনন্দিকে বলি চায়ের জল চাপাতে।

—ওটা আজ থাক প্রমিতা।

এ বাড়িতে ডাক্তরের চা প্রত্যাখান ? বড় বিস্ময় লাগল প্রমিতার। কোন কারণে কোনদিন ভুল-ত্রুটি হলে যে লোক নিজের পাওনা আদায়

না করে ছাড়তেন না, সেই কিনা—। ডাক্তারকে দেখেই প্রমিতা চায়ের কথা চেপে গেল। বুঝতে এতটুকু দেরী হল না, ছোটমার শূন্য ঘরে চা নিয়ে মৌতাত করতে তাঁর প্রাণাধিক সন্তানটি আজ সত্যিই অপারক। সময় নেবেন ধাতস্থ হতে!

ডাক্তার ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কি মনে হতেই রাস্তা থেকে আবার ফিরলেন।

—যাই বল প্রমিতা নিখিলেশ-লী থাকাতে বাড়িটা বেশ জম-জমাট ছিল। আজ তুমি সত্যি একা!

—আমি একা? কে বলে? প্রমিতা প্রতিবাদ করল সঙ্গে সঙ্গে।

—তার মানে?

—মানে বাড়ি জম-জমাটই আছে।

—তাহলে কি নিখিলেশ-লী যায়নি?

—কোন সকালে চলে গেছে।

—তাহলে?

প্রমিতা হাসছে। হাসির অর্থ ধরতে না পেরে ডাক্তার চোখ থেকে চশমা খুলে চারদিকে দেখলেন ওপর পর্যন্ত—যতদূর দেখা যায়। সম্পূর্ণ হার মানলেন—কিছুই ত বুঝতে পাচ্ছি না।

—বুঝতে পাচ্ছো না? তাহলে এস!

প্রমিতা ডাক্তারের হাত ধরে ওপরে এনে নিজের শোবার ঘরের সামনে দাঁড় করাল। কিন্তু কারুর মুখে আর কথা নেই।

স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা এতক্ষণে যেন কাটিয়ে উঠতে পারলেন ডাক্তার।

—এ সব কী প্রমিতা?

লী—সগর্বে উত্তর দিল প্রমিতা—তার দিদিকে দিয়ে গেল।

ডাক্তার ঘরের মধ্যে এসে নিচু হয়ে তন্ময় ভাবে দেখলেন কতক্ষণ।

ছোট বেতের দোলনায় শিশুটি ঘুমোচ্ছে অকাতরে। রেশমের দড়ি ধরে ঘরের এক কোণে টুলে বসে আনন্দি দোল দিচ্ছে আস্তে আস্তে। টেবিল ল্যাম্পের ওপর তোয়ালে চাপা দেওয়া—উৎকট আলোয় যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

বিছানাটায় একবার হাত বুলিয়ে প্রমিতা নিশ্চল ডাক্তারকে যেন নাড়া দিল—হল কী? এমন চুপচাপ কেন?

—ভাবছি!

—আবার ভাবনার হল কী?

—তুমি একাই শুধু ত্যাগ করে আসনি প্রমিতা! শান্ত গলায় বললেন ডাক্তার—ওই বিদেশী মেয়েটার ত্যাগটাও মনে রাখবার মতন। এ ত্যাগ যে কতখানি—

রোষের সঙ্গে প্রমিতা ডাক্তারের কথার মাঝে যেন ঝলসে উঠল—আমরা তুজনে কি ত্যাগের প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছি যে ওজন করতে হবে কে কতখানি ত্যাগ করল?

—তা নয়—প্রমিতার তুই কাঁধে হাত রাখলেন ডাক্তার—কত বড় প্রাণ হলে তবে এ জিনিষ দেওয়া যায়!

—আমাদের সম্পর্কটাই যে দেওয়া-নেওয়ার বাইরে, ডাক্তার।

—তা জানি। কিন্তু—

—কিন্তু কী? প্রমিতা দাঁড়াল এবার ডাক্তরের মুখোমুখি।

—মানুষ করতে পারবে ত?

ডাক্তারের সন্দেহ প্রমিতাকে যেন আঘাত দিল। তখনি ফেটে পড়ল আত্মশক্তিতে—পারব না? একটা ছেলেকে যদি মানুষ করতে না পারব—তবে বাঙালী ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালুম কেন?

কেদার মন্দিরের সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। নাস্তিক ডাক্তারের আজ শুধু শব্দ বলেই মনে হল না—মনে হল তাঁর, ও ধ্বনি যেন প্রমিতার আত্মপ্রত্যয়ের পূর্ণ সমর্থন।

—শেষ—